ইউনিট-৬

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ এবং পরিবেশগত অধঃপাত

(Human Intervention in Physical Environment and Environmental Degradation)

পরিবেশে মানুষের হস্তক্ষেপ ও পরিবেশ অধঃপাত বিষয়টি আলোচনার পূর্বে পরিবেশ কাকে বলে জানা দরকার। প্রাণী, উদ্ভিদ, মানব, সমাজ বা সমাজগোষ্ঠীকে পরিবৃত্ত করে যে সামগ্রিক বাহ্যিক অবস্থা তাকে সাধারণভাবে পরিবেশ বলে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশ বলতে খুব সীমিত অর্থে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বোঝানো হয় যা মানুষকে বাদ দিয়ে বা মানুষের আগমনের পূর্বে ছিল। তবে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ হলো মূলত প্রকৃতি এবং প্রকৃতিতে মানুষের সমগ্র কর্মকান্ডের সমষ্টিগত রূপ। প্রকৃতিতে মানুষের কর্মকান্ড, আচরণ মানুষের যুক্তি-বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রকৃতির সাথে মানুষের সমন্বয় স্থানিক অবস্থান সাপেক্ষে হয়ে থাকে। ফলে প্রকৃতি ও মানুষের কার্যকারণ, আচরণের ভিন্নতার কারণে পরিবেশের মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়। কাজেই পরিবেশ প্রাকৃতিক ও মানবিক উভয় পরিবেশের সমন্বয়ে গঠিত।

পৃথিবীর আয়তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত কিন্তু বিশ্ব জনসংখ্যা অপ্রতিরোধ্য গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে বিগত কয়েক দশকে বিশ্ব জনসংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের বিভিন্ন প্রকার হস্তক্ষেপে মানুষের বাসপোযোগী পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্তন বিপর্যয়ের প্রান্তে ঠেকেছে এবং ভূমির বহন ক্ষমতা মাত্রা (Carrying Capacity of Land) অতিক্রম করেছে। প্রকৃতিকে অবিবেচকের মতো ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর যে প্রভাব পড়েছে তাতে মানুষের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখিন। মানুষ কর্তৃক প্রাকৃতিক পরিবেশকে অবিবেচকের মত যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পরিবেশগত অধঃপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিবেশের এই অধঃপাত প্রক্রিয়া এই ইউনিটটিতে আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিটে পরিবেশ বিপর্যয়ের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি; পরিবেশ বিপর্যয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়া, যেমন বৃক্ষ বা বননিধন, অধিক উৎপাদন, মৎস্য শিকার, গোচারণ, বিভিন্ন প্রকার দূষণ ও দূষণজনিত ব্যাধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের সাথে সমন্বয় কৌশল সম্বন্ধে কয়েকটি পাঠ রয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

পাঠ-৬.১: প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ বা পরিবেশে মানব সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া : সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
পাঠ-৬.২: বন নিধনকরণ (Deforestation); অতি চাষ, মৎস্য শিকার ও পশুচারণ
পাঠ-৬.৩: পরিবেশ দূষণ ও রোগব্যাধি
পাঠ-৬.৪: অন্যান্য দূষণ মাধ্যম
পাঠ-৬.৫: প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও মানুষের সমন্বয় কৌশল

পাঠ-৬.১

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ বা পরিবেশে মানব সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া : সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

(Human Intervention in Physical Environment or Reaction of Human Activities on Physical Environment : Definition and Nature)

এই পাঠ পড়ে আপনি-

◆ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের হস্তক্ষেপের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

মানুষ প্রকৃতি থেকে জীবনধারণ ও জীবনযাপনের জন্য বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে। জীবনযাপন ও জীবনধারণের উপাদান সংগ্রহ ব্যক্তিক এবং সমষ্টিগত বা সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত চাহিদা পূরণ প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিভিন্নভাবে চাপ পড়ে। বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির উপর অত্যধিক চাপের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশে সৃষ্ট বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়। পরিবেশের উপর এই বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে পরিবেশগত বিপর্যয় বলা হয়।

পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রকৃতি (Nature of Degradation of Environment)

পরিবেশ বিপর্যয়ের পিছনে বিভিন্ন নিয়ামকসমূহ কাজ করছে। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীতে মানুষের জীবনযাপন প্রণালীতে অনেক পরিবর্তন আসে। ফলে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা বেড়ে যায় এবং সেই চাহিদা অনুসারে ভোগের উপকরণাদির প্রকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যা শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তিগতভাবে যে দেশ যত উন্নত, আর্থনীতিকভাবে সে দেশ তত সমৃদ্ধ। ফলে চাহিদার পরিমাণও অধিক, সাথে সাথে শিল্প আবর্জনা বা শিল্প বর্জ্যের পরিমাণও অধিক। এই সমস্ত দেশে পরিকল্পিত উপায়ে শিল্পবর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও অপসারণের বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং দূষণমাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ শিল্প ক্ষেত্রে ততটা উন্নত না হলেও যেটুকু শিল্পায়ন হয়েছে তার প্রভাবেই পরিবেশ অতি দ্রুত হারে দূষিত হচ্ছে। এর কারণ শিল্পবর্জ্য অপসারণ বা পুর্নব্যবহারের সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব।

প্রযুক্তিগত উন্নতি মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি করেছে এবং সাথে সাথে মৃত্যুহার কমিয়েছে। বিশেষ করে শিশুমৃত্যু হার অনেক হ্রাস পেয়েছে। ফলে পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ-প্রায় পৌনে দুই বিলিয়ন থেকে ছয় বিলিয়নে পৌঁছেছে। বিগত কয়েক দশকে বিশ্ব জনসংখ্যা, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনসংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে যে পরিবেশের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে পরিবেশের অধ:পাত ঘটাচ্ছে।

১৯৭০ দশকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণে সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) খাদ্যের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে সত্যি কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলে উন্নত কৃষি জমির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগই শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বার বার একই জমির ব্যবহার মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে ফেলছে। যার ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে উৎপাদন হ্রাস পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাদ্য, আবাসন ও অন্যান্য চাহিদা মেটানোর জন্য বনভূমি কেটে কৃষি ভূমি এবং আবাসভূমি ও অন্যান্য ভূমি ব্যবহারে রূপান্তর করা হচ্ছে যা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া ফেলছে। বনভূমি প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরী। ভূমন্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য বন নিধনকে অন্যতম একটি কার্যকরী নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা হয়। উল্লেখিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশের অধ:পাত ঘটছে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

১. পরিবেশ বিপর্যয় কাকে বলে?

২. প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয়ে কি কি নিয়ামক ক্রিয়াশীল ?

৩. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কিভাবে পরিবেশকে ধ্বংস করছে?

৪. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্বন্ধে লিখুন।

নিচের সারাংশটি পড়ে পাঠটি সম্বন্ধে আপনার ধারণা আরও স্পষ্ট করুন।

পাঠসংক্ষেপ :

মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক পরিবেশকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণ করছে এবং পরিবেশের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। পরিবেশের এই বিপর্যয়ের অন্যতম নিয়ামক হলো প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীতে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন উন্নয়নের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষের চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনও বহুমুখী হয়েছে। শিল্পের প্রসারের ফলে শিল্প বর্জ্যের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে দূষিত করছে। প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভূমি ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে চাপ পড়েছে। অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষিভূমি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়ে গিয়েছে এবং একই জমি বারংবার ব্যবহারের ফলে জমি তার উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হারাচ্ছে। বনভূমি আবাসভূমিতে পরিণত হচ্ছে। বনভূমি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমান্বয়ে তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন (সময় ৪ মিনিট):

১.১ মানুষ কোথা থেকে জীবনধারণ ও জীবনযাপনের উপাদান সংগ্রহ করে ?
ক. প্রকৃতি খ. বায়ুমন্ডল গ. ব্যবসা

১.২ কে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায় ?
ক. পশুপাখি খ. গাছপালা গ. মানুষ

১.৩ শিল্প বিপ্লবের পর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে কি হয়েছে ?
ক.চাহিদা বেড়েছে খ. চাহিদা কমেছে গ. পরিবেশ দূষণ কমেছে

১.৪ পৃথিবী ব্যাপী জনসংখ্যা কেন বৃদ্ধি পেয়েছে?
ক. শিক্ষার উন্নতি খ. প্রযুক্তিগত উন্নতি গ. অর্থনৈতিক উন্নতি

২. শূন্যস্থান পূরণ করুন (সময় ৩ মিনিট):

২.১ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণে ....খাদ্যের উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে।

২.২ অধিকাংশ অঞ্চলে উন্নত ....সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগই শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.৩ ..... প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (সময় ৬ মিনিট):

১. পরিবেশের বিপর্যয় কাকে বলে ?
২. পৃথিবী ব্যাপী জনসংখ্যা কি কি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে?
৩. অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশসমূহে পরিবেশ কিভাবে বিপর্যয় হচেছ?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১.পরিবেশ বিপর্যয় বলতে কি বোঝায় ? পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রকৃতি আলোচনা করুন।

পাঠ-৬.২

বন নিধনকরণ (Deforestation); অতি চাষ, মৎস্য শিকার ও পশুচারণ (Over Cultivation, Fishing and Grazing)

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ◆ পরিবেশের উপর বননিধনের প্রভাব সম্বন্ধে জানতে পারবেন; এবং
- ◆ অতি চাষ, মৎস্য শিকার ও পশুচারণ কি প্রক্রিয়ায় পরিবেশের অধ:পাত ঘটায় তা জানতে পারবেন।

বন নিধনকরণ (Deforestation)

বননিধনকরণ পরিবেশ অধ:পাতের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। তবে পৃথিবী ব্যাপী বনশূন্যতার হার নির্ধারণ বা মূল্যায়ন করার ব্যাপারে দুটি প্রধান সমস্যা রয়েছে। প্রথমত: বিভিন্ন দেশের সরকার পুরনো উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যিকার চিত্র দেওয়া হয় না, দ্বিতীয়ত: বন নিধনের স্থানীয় স্বল্পকালীন প্রভাব নির্ণয় করা গেলেও বনশূন্যতার সুদূর প্রসারী পৃথিবীব্যাপী প্রভাব নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ৮০ এর দশকে FAO এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় ১১.৩ মিলিয়ন হেক্টর ক্রান্তীয় অরণ্য ভূমি প্রতি বছর বনশূন্য হয়েছে যার আয়তন অষ্ট্রিয়া এবং বেলজিয়ামের প্রায় সমান। এছাড়াও প্রতি বছর বাণিজ্যিক কারণে কাঠের গুড়ির জন্য অতিরিক্ত ৪.৪ মিলিয়ন হেক্টর অরণ্যভূমি নিধন করা হয়। এর ফলে এক তৃতীয়াংশ বা তারও অধিক পরিমাণ অবশিষ্ট গাছের ক্ষতি হয়। এই সমস্তের মধ্যে পতিত জমি এবং কৃষিভূমিতে অবস্থিত ব্যাপকভাবে বৃক্ষের অধ:পাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যাপক বৃক্ষশূন্যতার প্রভাব পরিবেশের উপর পড়ে এবং পরিবেশের অধ:পাত ঘটাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. বন শূন্যতার হার নির্ধারণ করার দুটি প্রধান সমস্যা কি কি?

২. বন নিধনকরণ কি ভাবে পরিবেশের অধ:পাত ঘটায়?

বন নিধনকরণের কারণ (Causes of deforestation)

বনশূন্যতার অন্যতম প্রধান কারণ বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এছাড়াও বাণিজ্যিক ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনে কাঠের গুড়ির জন্য গাছ কাটা হয়। পশুচারণের জন্যও বনশূন্যতা হয়ে থাকে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাজান অঞ্চল ছাড়া অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের বনশূন্যতার অন্যতম প্রধান কারণ। অতিরিক্ত খাদ্যের চাহিদা মেটাতে বনভূমি কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে কৃষিভূমি ৫৯ মিলিয়ন হেক্টর বেড়েছে। অন্যদিকে বনভূমি ১২৫ মিলিয়ন হেক্টর কমে গিয়েছে। বনভূমি কৃষি ভূমিতে রূপান্তরের পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। এই একই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়িঘর, শিল্প প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, ইত্যাদিতে মাথাপিছু ০.০৫ হিসেবে সর্বমোট ৫০ মিলিয়ন হেক্টরের বেশি বনভূমি অকৃষি ভূমিতে পরিণত হয়েছে। নগর সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় ১০০ মিলিয়ন হেক্টরের উপর কৃষিভূমি নগরাঞ্চলে রূপান্তরিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ও অন্যান্য চাহিদা পূরণে বিশ্বের ৮০ ভাগ বনভূমিই কৃষি ও অকৃষি কাজে রূপান্তরিত হওয়ায় বনশূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আমাজন ছাড়া অধিকাংশ বনশূন্যতার একমাত্র কারণই হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

ক্রান্তীয় অঞ্চলে বাণিজ্য ভিত্তিক কাঠের গুড়ি কাটা হয়ে থাকে। এটি মুনাফা অর্জনকারী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যার মাধ্যমে অতি আয়াসে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। কাজেই ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো গাছের গুড়ি রপ্তানি। এই সমস্ত দেশসমূহে বনভূমি পুন:বিকাশের কথা চিন্তা না করে কাঠের গুড়ির জন্য গাছ নির্বিচারে কাটা হয়ে থাকে। ফলে বনশূন্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশুচারণ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর একটি অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দুই-পঞ্চমাংশ বনশূন্যতার অন্যতম প্রধান কারণই হলো বনভূমিতে পশুচারণ।বৃষ্টি-প্রধান ক্রান্তীয় অঞ্চলের অনুর্বর জঙ্গল পরিষ্কার করে চারণভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হয় যা ক্রমান্বয়ে আরও অনুর্বর ভূমিতে

পরিণত হতে থাকে। ফলে একই সংখ্যক পশু পালনের জন্য প্রতি বছর অতিরিক্ত বনভূমি পরিষ্কার করে পশুচারণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বনভূমি ক্রমান্বয়ে চারণভূমিতে রূপান্তরিত হতে থাকে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. বনশূন্যতার প্রধান কারণ কি কি ?
২. বনভূমি কেন কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে?
৩. বনভূমি অকৃষিভূমিতে কি কি প্রকারে রূপান্তরিত হচ্ছে?
৪. ক্রান্তিয় অঞ্চলে কিভাবে বনশূন্যতা হচ্ছে?
৫. পশুচারণ ল্যাটিন আমেরিকায় কি ভাবে বনশূন্যতা ঘটাচ্ছে?

পরিবেশের উপর বনশূন্যতার প্রতিক্রিয়া
(Reaction of Deforestataion on Environment)

পরিবেশের উপর বনশুন্যতার নিম্নরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়:

(ক) ভূমিক্ষয় ও ভূমির উপরিভাগের মাটি অপসারণ (Erosion of Land and Removal of Top Soil) :

ভূমিক্ষয় বনশূন্যতার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। বনশূন্যতার কারণে ভূমি ক্ষয় হয়ে নালার জলে পরিণত হয়। বৃক্ষ মাটিকে ধরে রাখে। ভূমি বনশূন্য হলে বৃষ্টির পানিতে ভূ-উপরিভাগের মাটি দ্রুত অপসারিত হয়। বনভূমি না থাকলে ভূগর্ভে পানি প্রবেশের মাত্রাও হ্রাস পায়। ফলে ভূ-উপরিভাগে পানি প্রবাহের গতি বৃদ্ধি পায় এবং পানি প্রবাহের সাথে অধিক হারে পলি স্থানান্তরিত হয়ে নদীর তলদেশে জমা হতে থাকে এবং নদী তলদেশ উঁচু হয়ে বর্ষা মৌসুমে বা অতি বৃষ্টিতে বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও বনভূমি না থাকার কারণে ভূগর্ভে পানি প্রবেশের মাত্রা হ্রাস পেলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নামতে থাকে এবং ভূপৃষ্ঠের মাটি শুষ্ক হতে শুরু করে। ফলে মরুপ্রবণতা এবং ভূমি ক্ষয় সক্রিয় হয়। যদি পাহাড়ের গাত্র বনশূন্য হয় তাতে ঘন ঘন ভূমিধস হতে থাকে। ভূমিক্ষয়ের সাথে ভূপৃষ্ঠের মাটির জৈব এবং অন্যান্য পুষ্টিকর পদার্থ অপসারিত হয় যা আর সহজে পূরণ হয় না। ফলে ফসলের উৎপাদন খুব দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। শুষ্ক অঞ্চলে অতি মাত্রায় পশুচারণ বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো লতাগুল্ম ও তৃণজাতীয় উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন করে যা ভূমি ক্ষয়ে ভূমিকা রাখে।

(খ) উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ক্ষতিসাধন (Loss of Plants and Animals) :

ক্রান্তীয় মন্ডলের বনভূমিসমূহ বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর সমৃদ্ধ ভান্ডার। কিন্তু বনশূন্যতার ফলে উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর অনেক প্রজাতি ইতোমধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ওষুধ প্রস্তুতে ক্রান্তীয় মন্ডলের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ব্যাপক হারে ব্যবহারের ফলে এই সমস্ত উদ্ভিদের অধিকাংশ লুপ্ত হওয়ার পথে বা ইতোমধ্যেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও উচ্চ ফলনশীল খাদ্য উৎপাদনের জন্য দেশজ অনেক প্রকারের ক্রান্তীয় শস্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

বনশূন্যতার সুদূর প্রসারী ভূমন্ডলীয় প্রভাব এখনও পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা না গেলেও কিছু কিছু প্রভাব ইতোমধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন বনশূন্যতার ফলে মাটির আর্দ্রতা কমে গিয়েছে, বৃষ্টিপাত কমে গিয়ে নদীতে পানি প্রবাহ কমে গিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বনশূন্য এলাকা থেকে অধিকমাত্রায় সৌর তাপ বায়ুমন্ডলে ফিরে গিয়ে ভূমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমনও ধারণা করা হচ্ছে যে ব্যাপক আকারে বনশূন্যতার কারণে ভূমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন আনবে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে যাকে গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়া বলা হয়। এর প্রভাবে এন্টারটিকা মহাদেশ এবং গ্রীনল্যান্ডের বরফের আচ্ছাদন গলে গিয়ে সমুদ্রের পানির স্তর বেড়ে গিয়ে পৃথিবীর নিচু এলাকাসমূহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে পারে। তবে এই বিষয়টি এখনও পর্যন্ত গবেষণা সাপেক্ষ। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ভূমন্ডলের বৃষ্টিপাতের প্যাটার্নেও যদি পরিবর্তন হয় তবে কৃষি সমৃদ্ধ এবং কৃষিভিত্তিক আর্থনীতিক অঞ্চলে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. পরিবেশের উপর বনশূন্যতার প্রতিক্রিয়া কি কি?
২. বনশূন্যতার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি?
৩. ভূগর্ভস্থ পানি কেন হ্রাস পায়?
৪. ভূগর্ভস্থ পানি হ্রাস পেলে কি প্রতিক্রিয়া হয়?
৫. পাহাড়ের গাত্র বনশূন্য হলে কি প্রতিক্রিয়া হয়?

৬. ভূমি ক্ষয়ের ফলে কি প্রতিক্রিয়া হয়?
৭. শুষ্ক অঞ্চলে অতি মাত্রায় পশুচারণের ফলে কি ঘটে?
৮. ক্রান্তীয় অঞ্চলে বহু উদ্ভিদ কি কি কারণে লুপ্ত প্রায়?
৯. বনশূন্যতার সুদূর প্রসারী প্রভাব কি কি?
১০. গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে কোন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে?
১১. গ্রীণ হাউসের প্রভাব পৃথিবীর উপর কি প্রভাব ফেলবে?

অতি চাষ, মৎস্য শিকার ও পশুচারণ (Over Cultivation, Fishing and Grazing)

অতি চাষ (Over Cultivation) : অতি চাষ অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত উন্নয়নশীল দেশসমূহের বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশসমূহে কৃষি প্রধান উপজীবিকা। এই সমস্ত দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য অধিকাংশ চাষযোগ্য কৃষিভূমি নিবিড় চাষের আওতাধীন এবং বিরতিহীনভাবে শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত। ১৯৭০ এর দশকে সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) শুরু হলে চাষযোগ্য উন্নত কৃষিভূমির অধিকাংশই চাষভুক্ত হয়। সবুজ বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিভিন্নভাবে অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এর ফলে উচ্চ ফলনশীল ধানের উদ্ভব ঘটে এবং প্রধান খাদ্য উৎপাদনে একই জমি বিরতিহীনভাবে ব্যবহার হতে থাকে। ফলে কৃষিজমিতে বিভিন্নভাবে এর প্রতিক্রিয়া পড়ে।

একই জমি একই ফসল উৎপাদনে ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কালক্রমে জমির উর্বরতা হ্রাস পেতে থাকে। উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও পানির প্রয়োজন। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত পানির প্রয়োজন মেটানো হয়। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানি স্তর ক্রমাগত নিচে নামতে থাকে। ফলে মাটি তার আর্দ্রতা ক্রমান্বয়ে হারাতে থাকে। একই জমি একই ফসল উৎপাদনে ক্রমাগত ব্যবহার, অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে জমির উর্বরতা এবং ফসল উৎপাদন ক্ষমতা উভয়ই ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। জনসংখ্যার অতি উচ্চ বৃদ্ধির কারণে খাদ্য ঘাটতি একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। যার ফলে প্রান্তিক ভূমিতে চাষ শুরু হয়। এই সমস্ত প্রান্তিক ভূমি সাধারণত অনুর্বর পার্বত্য বা স্বল্প বৃষ্টিপাতসম্পন্ন উষর অঞ্চল হয়। শস্য উৎপাদনে এই সমস্ত অঞ্চল ব্যবহার করা হলে ভূমিক্ষয়, ভূমিধস এবং মরুয়ায়ন প্রক্রিয়ায় মাটির উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সামগ্রিক পরিবেশের অধ:পাত ঘটে।

কৃষি-নির্ভর অত্যধিক জনসংখ্যা কৃষিভূমির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। চাষের জমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত হয়ে এক পর্যায়ে চাষযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেও কৃষক শস্য উৎপাদনের জন্য প্রান্তিক ভূমিতে সরে যায় যা ক্রমান্বয়ে উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে অচাষযোগ্য ভূমিতে পরিণত হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, অতি চাষ জমির উর্বরতা নষ্ট করে, উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে এবং পরিশেষে কৃষককে প্রান্তিক ভূমির দিকে ঠেলে দেয় যা আবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে ভূমিধস হয়, মরুয়ায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং পরিশেষে কৃষি জমি উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে অচাষযোগ্য জমিতে পরিণত হয়।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. কৃষি জমিতে সবুজ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া কি?
২. অতি চাষ কোন দেশসমূহে হয়ে থাকে?
৩. কি কি কারণে জমির উর্বরতা এবং ফসল উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়?
৪. প্রান্তিক ভূমি ফসল উৎপাদনে ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া কি?
৫. চাষের জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া কি?

অতি মৎস্য শিকার (Over Fishing)

মৎস্য শিকার পৃথিবীর অনেক দেশের একটি অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। আবার কোন কোন দেশের মৎস্য শিকারই প্রধান উপজীবিকা। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শিল্পজাত রাসায়নিক পদার্থ নদী এবং অন্যান্য স্বাদু পানির জলাশয়ে মিশ্রিত হওয়ার কারণে স্বাদু পানির মাছ লুপ্তপ্রায়। ফলে উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশ বর্তমানে সমুদ্রের মাছ শিকার করে মাছের চাহিদা মেটায়। সমুদ্র তীরবর্তী অধিকাংশ দেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনসংখ্যা

সামুদ্রিক মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিভিন্ন প্রকারের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সামুদ্রিক মাছ শিকার করা হয়। ফলে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে মৎস্য ধরা পড়ে। কিন্তু সেই তুলনায় মাছ পরিপূরণ হয় না। কোন কোন মাছ খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত জনপ্রিয়তার জন্য কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জাপানি এবং কয়েকটি জাতির কাছে তিমি মাছের মাংস বিভিন্ন প্রয়োজনে বলবর্ধক হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। অতিরিক্ত তিমি মাছ আহরণের ফলে তিমি মাছ বিলুপ্তর পথে। বর্তমানে তিমি মাছ ধরার উপর বিশ্বব্যাপী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

উন্নয়শীল বিশ্বে স্বাদু পানির মাছ জনপ্রিয়। তবে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে কৃষি ও অকৃষি কর্মকান্ড সম্প্রসারণের ফলে নদী, পুকুরসহ অন্যান্য জলাশয় দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কৃষি জমিতে অত্যধিক রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে বৃষ্টির পানির সাথে রাসায়নিক পদার্থ কৃষি ভূমি, নদী, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে পড়ে। ফলে স্বাদু পানির বহু প্রজাতির মাছ ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সমুদ্রের মাছ শিকার করে মাছের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা হয়। তবে মাছ আহরণ পদ্ধতি ততটা উন্নত না হওয়ায় বিভিন্ন প্রকারের মাছ নির্বিচারে ধরা পড়ে, বিশেষ করে মাছের পোনা। ফলে মাছের বংশ বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মাছের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এছাড়াও যে সমস্ত মাছ ধরা পড়ে তার উল্লেখযোগ্য অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় না, বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়। সমুদ্র থেকে নির্বিচারে মাছ উত্তোলন সমুদ্র বাস্তব্যের ভারসাম্য নষ্ট করছে।

এছাড়াও বিভিন্ন উন্নত দেশসমূহের রাসায়নিক বিষাক্ত বর্জ্য উন্নয়নশীল বা দরিদ্র দেশসমূহের সমুদ্রসীমায় নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বঙ্গোপসাগর উন্নত দেশসমূহের রাসায়নিক বিষাক্ত বর্জ্য নিক্ষেপের একটি অন্যতম প্রধান স্থান। উন্নত দেশসমূহের বিভিন্ন হ্রদ এবং নদীর পানি রাসায়নিক বর্জ্যের দ্বারা ভারী হয়ে গিয়েছে যা মাছ টিকে থাকার জন্য অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাছের বংশ বৃদ্ধি এবং বিচরণের পরিবেশ ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. স্বাদু পানির মাছ কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ?
২. উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ কি ভাবে মাছের চাহিদা মেটায়?
৩. যে পরিমাণ মাছ ধরা হয় সেই পরিমাণ মাছ কেন পূরণ হয় না?
৪. তিমি মাছ ধরার উপর কেন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে?
৫. সমুদ্রের মাছের বংশ বৃদ্ধি কি প্রকারে ব্যাহত হচ্ছে?

অতি চারণ (Over Grazing) :

পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমি বিভিন্ন প্রকার ও মাত্রার মরুভূমি যা কৃষিভূমি হিসেবে ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী। পৃথিবীর প্রধান মরুভূমিগুলো যেমন আটাকামা, সাহারার প্রান্তিক অঞ্চলসমূহ মূলত পরিবর্তনশীল এলাকা হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলগুলোতে যে সমস্ত বছরে ভাল বৃষ্টিপাত হয় সেই বছরগুলোতে যাযাবর শ্রেণীর পশুপালকদের পশুচারণের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু বৃষ্টিহীন বছরগুলোতে এই সমস্ত অঞ্চল পশুচারণের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ পানির অভাবে তৃণভূমি ঊষর ভূমিতে পরিণত হয়। আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল এই রকম একটি প্রান্তিক ভূমি। ১৯৭০ পরবর্তীতে ক্রমাগত অনাবৃষ্টির কারণে মৌরীতানিয়া, সেনেগাল, মালি, বুরকিনা ফাসো, নাইজার ইত্যাদি অঞ্চলের দেশসমূহের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। সাহেলীয় প্রান্তিক ভূমি ছাড়িয়ে জলাবায়ুর দিক থেকে কিছুটা উন্নত প্রায়-শুষ্ক অঞ্চল রয়েছে। এই ধরনের পরিবেশ উপরে উল্লেখিত দেশসমূহের কিছু অংশে এবং সুদান, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, তানজানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু অংশে, বিশেষ করে বোতসোয়ানায় দেখা যায়। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার ইসরাইল থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত দেশগুলো, ভারতের থর মরুভূমি এবং দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার কিছু অংশ এবং উত্তর চিলিও একই ধরনের প্রায়-শুষ্ক অঞ্চল। এই সমস্ত অঞ্চলে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত লোকসংখ্যা বাস করে, যাদের উপজীবিকা মূলত পশুপালন ও পশুচারণ। অতি পশুচারণের জন্য ভূমিক্ষয় হয় এবং ভূমি আলগা হয়ে ভূ-উপরিভাগের বালুকণা বায়ুতাড়িত হয়ে স্থানান্তরিত হয় এবং পরিশেষে মরুয়ায়ন প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত অঞ্চলে লোকসংখ্যা ও পশুচারণ আর্দ্র বছরগুলোর জন্য কোন সমস্যা নয়। কিন্তু শুষ্ক সময়ের জন্য তা ভূমির ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে যায় এবং ভূমির উপর চাপ পড়ে। কারণ, এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা তৃণভূমির সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে অভিগমন করে এবং এই প্রক্রিয়ায় মরুয়ায়ন প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ ঘটে। এক আনুমানিক হিসাবে দেখা গিয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে বিশ্বে বর্তমান সময়ে ব্রাজিলের চেয়েও বৃহত্তর অঞ্চল মরুয়ায়নের আওতাভুক্ত।

মানুষ এবং পশুর চারণভূমির সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে অভিগমন নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, জনসংখ্যা ও পশুসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে মরুয়ায়ন প্রক্রিয়া রোধ করা সম্ভব। আলজেরিয়া বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন বনায়ন, পরিকল্পিত সেচ এবং নতুন ধরনের শস্য পদ্ধতির মাধ্যমে মরুয়ায়ন রোধে সাফল্য অর্জন করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার অধিক জনসংখ্যার দেশসমূহে মানুষের বাসস্থান এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে পতিত এবং গোচরণভূমির অধিকাংশ ব্যবহৃত হওয়ায় পশুচারণ ক্ষেত্রের সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে ফসল কাটার পর শস্যক্ষেত্র পশুচারণ ভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শস্যক্ষেত্রে ফসলকাটার পর ফসলের গোড়ার যে অংশটি রয়ে যায় তা পশু বিচরণ করে খেয়ে থাকে। পূর্বে চাষের সময় এগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা হতো। এতে করে জমির জৈবিক সারের প্রয়োজন কিছুটা হলেও মিটতো। বর্তমানে এগুলো পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের ফলে মাটি তার পুষ্টি অনেকখানি হারাচ্ছে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পশুচারণের মাধ্যমে ভূমি ও পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষতি হচ্ছে এবং পরিবেশের অধ:পাত ঘটছে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. প্রান্তিক ভূমি কি ভাবে ঊষর ভূমিতে পরিণত হয়?
২. অতি পশুচারণের প্রতিক্রিয়া কি?
৩. মরুয়ায়ন প্রক্রিয়ার কিভাবে সম্প্রসারণ ঘটে?
৪. আলজেরিয়া কি ভাবে মরুয়ায়ন রোধে সাফল্য অর্জন করেছে?
৫. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে কেন পশুচারণ ক্ষেত্রের সংকট দেখা দিয়েছে?
৬. শস্য কাটার পর শস্যক্ষেত্রে পশুচারণ কি ভাবে মাটির পুষ্টি নষ্ট করছে?

নিচের সারাংশটি পড়ে আপনার ধারণাটি আরও পরিষ্কার করে নিন।

পাঠসংক্ষেপ :

পরিবেশ মূলত প্রকৃতি এবং প্রকৃতিতে মানুষের সমগ্র কর্মকান্ডের সমষ্টিগত রূপ। মানুষ বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে জীবিকা এবং জীবন ধারনের উপাদান সংগ্রহ করে। এই উপাদান সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে এবং পরিবেশের অধ:পাত ঘটায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের অধ:পাতের অন্যতম প্রধান কারণ পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যার আশংকাজনক বৃদ্ধি। অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রকৃতি থেকে অধিক পরিমাণে জীবিকা এবং জীবন ধারনের উপাদান সংগ্রহ করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং সামগ্রিক পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে, পরিবেশের উপর যার সুদূর প্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে এবং বিভিন্নভাবে পরিবেশে প্রভাব ফেলে।

পরিবেশের অধ:পাতে বননিধন, অতিচাষ, অতি মৎস্য চাষ এবং অতিচারণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বননিধনের কারণে পৃথিবীব্যাপী বনশূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে সঠিক পর্যায়ে রাখার জন্য বনভূমির একান্ত প্রয়োজন। বনভূমি নিধনের পিছনে বিভিন্ন কারণ ক্রিয়াশীল। পৃথিবীব্যাপী অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাদ্যের প্রয়োজনে বনভূমি কেটে চাষের জমিতে পরিণত করা হচ্ছে। এছাড়াও ব্যবসাভিত্তিক বিভিন্ন প্রয়োজনে কাঠ রপ্তানি করেও বনভূমি ধবংস করা হচ্ছে। অতিচাষের কারণে জমি তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি হারাচ্ছে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে এবং সেচের মাধ্যমে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হলেও ক্রমাগত একই জমি বারংবার একই ফসল উৎপাদনে ব্যবহারের ফলে চাষের জমি ক্রমান্বয়ে উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে প্রান্তিক ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এছাড়া অতি মাত্রায় সেচ নির্ভর চাষ পদ্ধতির কারণে ভূগর্ভস্থ পানি স্তর নিচে নেমে গিয়ে মরুয়ায়নের প্রসার ঘটাচ্ছে। রাসায়নিক সারের অধিক ব্যবহার জমির উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করছে। অতি মৎস্য চাষের কারণে বিভিন্ন প্রজাতির অনেক জনপ্রিয় মাছ বিলুপ্তির পথে। অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে বাণিজ্য ভিত্তিক অধিক পরিমাণে মৎস্য আহরণের ফলে মৎস্য জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। মৎস্য আহরণের সময় মাছের পোনা অধিক পরিমাণে ধবংস হচ্ছে। ফলে মাছের স্বাভাবিক জীবনচক্র ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়াও মৎস্য আহরণের সময় অন্যান্য বিভিন্ন প্রজাতির অপ্রয়োজনীয় মাছ ধরা পড়ে ধবংস হচ্ছে। অতিচারণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের পশুপালন একটি অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। অতি পশুচারণের ফলে চারণক্ষেত্রগুলোর ধারণ ক্ষমতা অতিক্রম করে অনুর্বর ঊষর ভূমিতে পরিণত হয়। এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের পশুর পাল নিয়ে এক তৃণভূমি নি:শেষ করে অন্য তৃণভূমি এবং ক্রমান্বয়ে বনভূমিতে প্রবেশ করে। ফলে একই প্রক্রিয়ায় পশুচারণভূমি চারণক্ষেত্র হিসেবে অযোগ্য হয়ে ক্রমান্বয়ে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হয়। এইভাবে মরুয়ায়ন প্রক্রিয়ার প্রসার ঘটে। ফলে পরিবেশের অধ:পাত ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. সত্য হলে 'স' আর মির্থ্যা হলে 'মি' লিখুন (সময় ৩ মিনিট):

১.১ ১৯৭০ এর দশকে সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) শুরু হলে চাষযোগ্য উন্নত কৃষিভূমির অধিকাংশই চাষভুক্ত হয়।

১.২ শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শিল্পজাত রাসায়নিক পদার্থ নদী এবং অন্যান্য স্বাদু পানির জলাশয়ে মিশ্রিত হওয়ার কারণে লোনা পানির মাছ লুপ্তপ্রায়।

১.৩ পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমি বিভিন্ন প্রকার ও মাত্রার মরুভূমি যা কৃষিভূমি হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী।

১.৪ অতি পশুচারণের জন্য ভূমিক্ষয় হয় এবং ভূমি আলগা হয়ে ভূ-উপরিভাগের বালুকণা বায়ুতাড়িত হয়ে স্থানান্তরিত হয়।

২. শূন্যস্থান পুরণ করুন (সময় ৩ মিনিট):

২.১ বননিধনকরণ পরিবেশ ----------একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

২.২ ৮০ এর দশকে FAO-এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় --------- মিলিয়ন হেক্টর ক্রান্তীয় অরণ্য ভূমি প্রতি বছর বনশূন্য হয়েছে।

২.৩ জনশূন্যতার অন্যতম প্রধান কারণ বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা --------।

২.৪ ১৯৭১ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে কৃষিভূমি -------- মিলিয়ণ হেক্টর বেড়েছে।

২.৫ ১৯৭১ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দুই-পঞ্চমাংশ বনশূন্যতার প্রধান কারণই হলো বনভূমিতে ----------।

২.৬ ---------- মন্ডলের বনভূমিসমূহ বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর সমৃদ্ধ ভান্ডার।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (সময় ৪X২=৮ মিনিট):

১. বন নিধনের প্রধান কারণগুলো বিশে- ষণ করুন এবং প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লিখুন।

২. পরিবেশের উপর বনশূন্যতার প্রতিক্রিয়াগুলো ব্যক্ত করুন।

৩. অতি চাষের কারণ এবং অতি চাষের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লিখুন।

৪. সবুজ বিপ্লব কখন থেকে শুরু হয় এবং সবুজ বিপ্লবের ফলে পরিবেশের কিভাবে অধ:পাত ঘটে?

৫. পরিবেশের উপর অতি মৎস্য চাষ এবং অতি পশুচারণের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বন নিধনকরণ বলতে কি বুঝায়? বন নিধনকরণের কারণ ও পরিবেশের উপর বনশ ন্যতার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।

২. বন নিধনকরণ বলতে কি বুঝায়? অতি চাষ, মৎস্য শিকার, পশু চারণ কিভাবে বন নিধনের সাথে জড়িত।

পাঠ-৬.৩

পরিবেশ দূষণ ও রোগব্যাধি
(Enviromental Pollution and Diseases)

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মানুষ সৃষ্ট বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশ বা মানুষের বাসযোগ্য পরিবেশের যে দূষণ হচ্ছে সেই দূষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পরিবেশ দূষণ ও রোগব্যাধি (Environmental Pollution and Diseases)

পরিবেশ প্রাকৃতিক ও মানবিক উভয় পরিবেশের সমন্বয়ে গঠিত। অবশ্য পরিবেশ বলতে খুব সীমিত অর্থে অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বোঝায়। তবে সাধারণভাবে প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যে যে জৈবিক জীবন-প্রাণী ও উদ্ভিদকে ঘিরে যে সামগ্রিক বাহ্যিক অবস্থা তাকে পরিবেশ বলে। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ মূলত প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে মানুষের সমগ্র কর্মকান্ডের সমষ্টিগত রূপকে বোঝায়। প্রকৃতি ও মানুষের কার্যকারণ, আচরণের ভিন্নতার কারণে পরিবেশের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।

মানুষ তার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিভিন্নভাবে পরিবেশকে দূষিত করছে। মানুষের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দূষণকে সাধারণভাবে পরিবেশ দূষণ বলা হয়। মানুষ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পরিবেশ দূষণ করছে যার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া মানুষ এবং অন্যান্য জীবের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপর, পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকারক। পরিবেশ দূষণ পরিবেশের ব্যবহারিক ও জীবনযাপনের সুযোগসুবিধা সৃষ্টিকারী সমস্ত বস্তুর মধ্যে বৈকল্য বা স্বাভাবিক কার্যকারিতায় অক্ষমতা আনে। বর্তমানে পরিবেশ দূষণ একটি মারাত্মক এবং অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।

শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীতে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ ও উন্নতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন নি:সৃত বিভিন্ন রাসায়নিক বর্জ্য পানি, মাটি ও বায়ুকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত করছে। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীতে মানুষের জীবন মানের উন্নতির ফলে মানুষের মৃত্যুহার কমে গিয়েছে এবং জন্মহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার মাটি ও পানিকে ক্রমাগত বিষাক্ত করে তুলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকারের পরিবহন মাধ্যম বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত পরিবহন থেকে উত্থিত বিভিন্ন প্রকার গ্যাস বায়ুমন্ডলকে দূষিত করছে। শিল্প-কারখানা, ঘরবাড়ি ইত্যাদিতে জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পদার্থ দহনের ফলে বিভিন্ন গ্যাস প্রতিনিয়ত বায়ুর সাথে মিশ্রিত হয়ে বায়ু দূষণ করছে। এছাড়াও নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহার অনুপযোগী বিভিন্ন কঠিন বর্জ্য পদার্থ ও অন্যান্য আবর্জনা ও ময়লা শহরের পরিবেশ দূষণে ভূমিকা রাখছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে সব দূষক দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই সমস্ত দূষকের অগ্রগণ্য ভূমিকা রয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন যত বেশি হচ্ছে, দূষণের মাত্রাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দূষণ প্রতিরোধ একটি জটিল ও ব্যয় সাধ্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দূষণের এই মাত্রাকে ত্বরান্বিত করছে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুন।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

১. পরিবেশ দূষণ কাকে বলে?
২. পরিবেশ দূষণের ফলে কি হয়?
৩. শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কিভাবে পরিবেশ দূষণ করছে?
৪. পরিবেশ দূষণ প্রধানত কি কি মাধ্যমে হয়ে থাকে?

পরিবেশ দূষণের প্রকার (Types of Pollution) :

বিভিন্ন প্রকারের পরিবেশ দূষণকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ও মাটি বা মৃত্তিকা দূষণ। এছাড়াও আরও বিভিন্ন প্রকারের দূষণ রয়েছে যা পরিবেশের প্রভূত ক্ষতি করে।

বায়ু দূষণ ও রোগব্যাধি (Air Pollution and Diseases) :

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বায়ু দূষণ হয়। বিভিন্ন প্রকার পরিবহনে ব্যবহৃত জ্বালানি বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়াও শিল্প কারখানা ও বাড়িঘরে ব্যবহৃত জ্বালানি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস, শহরের ময়লা আবর্জনা পোড়ানো থেকে উৎপন্ন গ্যাস বায়ু দূষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

বিভিন্ন প্রকার মোটরযান, উড়োজাহাজ, মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত রকেট বায়ু দূষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। উন্নত বিশ্বে পরিবার প্রতি মোটরযানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এছাড়াও নগরায়নের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে শহরবাসী। এই জনসংখ্যা ক্রমশ বর্ধমান। নগরীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মোটরযানের সংখ্যাও বাড়ছে। ১৯৫০ সাল নাগাদ সমগ্র বিশ্বের মোটরযানের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ মিলিয়ন বা ৪ কোটি, ১৯৯০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে আনুমানিক ৪০০ মিলিয়ন বা ৪০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ফলে মোটরযান দ্বারা বায়ু দূষণ কি পরিমাণ বেড়েছে তা সহজেই অনুমেয়। যদিও মনে করা হয় মোটরযান জনিত বায়ু দূষণ মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলোর একটি অন্যতম সমস্যা, কিন্তু আগামীতে উন্নত বিশ্বের তুলনায় তৃতীয় বিশ্বে অধিক হারে নগরায়ন প্রক্রিয়া চলবে। ফলে মোটরযান থেকে নির্গত দূষকের পরিমাণও বাড়বে এবং মোটরযান দ্বারা বায়ু দূষণ তৃতীয় বিশ্বেই সর্বাধিক হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এক হিসাব অনুযায়ী বর্তমান শতকের ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) জনসংখ্যায় অধিকাংশ নগরপুঞ্জই উন্নয়নশীল বিশ্বে অবস্থিত। যার ফলে আনুমানিক প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বা ৩০ কোটি লোক এই সমস্ত নগরীয় পরিবেশে বায়ু দূষণের প্রভাবাধীন থাকবে।

মোটরযান থেকে যে সমস্ত দূষক বায়ুতে মিশ্রিত হচ্ছে সেগুলো হলো কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ, সালফার অক্সাইডসমূহ, হাইড্রোকার্বন এবং অন্যান্য ভাসমান বস্তুকণাসমূহ। এছাড়া গ্যাসোলিনের মান উন্নয়নের জন্য সীসা সংযোজনের ফলে বায়ুতে সীসা দূষণও যুক্ত হয়। আবার উড়োজাহাজ, রকেট থেকে নির্গত ধোঁয়ার সাথে হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড মিশ্রিত থাকে।

উপরোক্ত দূষকসমূহ মানুষ, যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড, শাসতন্ত্রের ক্ষতি সাধন করে এবং গাছপালা ধ্বংস করে, হাইড্রোকার্বন সূর্য রশ্মির সাথে মিলে নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড ধোঁয়া মিশ্রিত কুয়াশা বা ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে যা মানুষের চোখের জন্য ক্ষতিকারক। ধোঁয়াশায় চোখ জ্বালা করা ছাড়াও ফুসফুসের ক্ষতি, মাথা ব্যাথা, বুক জ্বালা, শ্বাসকষ্ট, বমি বমি ভাব, গলা ব্যথা ইত্যাদি নানা উপসর্গের সৃষ্টি করে। কার্বন মনোক্সাইড মানবদেহে রক্তের লোহিত কণিকায় অক্সিজেন বিশোষণ বিঘ্নিত করে এবং স্নায়ুবিক ও হৃদযন্ত্রের সমস্যার সৃষ্টি হয়। নাইট্রোজেন ও সালফার অক্সাইডসমূহ ফুসফুসের ক্ষমতা হ্রাস করে এবং শাসনালীর বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রকোপ ঘটায়। বায়ুতে সীসা দূষণ রক্ত সঞ্চালন, প্রজনন ও মূত্র গ্রন্থির কার্যক্ষমতা হ্রাস করে এবং শিশুদের শিক্ষণ ক্ষমতাও হ্রাস পায়। বিশেষজ্ঞদের মতে পরিবহন জ্বালানি নির্গত কোন কোন বিষাক্ত গ্যাস ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সার রোগের একটি কারণ। জ্বালানি পোড়ানো ধোঁয়া উদ্ভিদের সালোক সংশে- ষণ ক্ষমতা হ্রাস করে। হাইড্রোকার্বন গাছপালার বৃদ্ধি রোধ করে।

শিল্প কারখানা, বাড়িঘর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত জ্বালানি দহন থেকে সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে মিশ্রিত হয়। সালফার ডাই-অক্সাইড মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর শ্বাসতন্ত্রের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এছাড়াও মাথা ব্যাথা, কাশি, চোখ জ্বালা ইত্যাদি নানাবিধ উপসর্গ দেখা দেয়। পারিবারিক জীবনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, যেমন রেফ্রিজারেটর, পোকামাকড় নিধনের জন্য এ্যারোসল ইত্যাদি থেকে নাইট্রাস অক্সাইড এবং সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয় যা বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

শহরের যত্রতত্র আবর্জনার স্তুপ নগর সভ্যতার একটি ক্ষতিকর অবদান। বিশ্বের বড় বড় শহরগুলো বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোর দৈনন্দিন বর্জ্য ও আবর্জনা পরিষ্কার করা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত বর্জ্য ও আবর্জনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুড়িয়ে ফেলা হয়। বর্জ্য ও আবর্জনা পোড়ানো থেকে উত্থিত ধুলো ও পারদ মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে। বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন দূষক কণিকা মানুষের শ্বাসতন্ত্রে জমা হয়ে হাঁপানি এবং শ্বাসনালীর প্রদাহজনিত রোগের সৃষ্টি করে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য পদার্থ থেকে নির্গত ক্লোরিন গাছপালা ও ফলমূলের ক্ষতি করে।

শিল্পোন্নত দেশসমূহে অম্ল বৃষ্টিপাত একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। কয়লা পোড়ানোর সময় আয়রন সালফাইডের কিছু কণা পুড়ে গিয়ে সালফার-ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলে মিশে যায়। সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং সাথে নাইট্রাস অক্সাইড বায়ুমন্ডলে পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে সালফিউরিক এসিডে পরিণত হয় এবং অম্ল বৃষ্টিপাত ঘটায়। অম্লমিশ্রিত বৃষ্টিপাত মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ বিকাশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই বৃষ্টিপাতের ফলে জলাশয়সমূহের অম্লীকরণ ঘটে এবং মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদান বিনষ্ট হয়। এর ফলে পাতা ঝলসে হলদে বর্ণের হয় এবং পরিশেষে কুঁচকে গিয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ঝরে যায়। মৃত্তিকায় অম্লত্বের পরিমাণ বেড়ে গেলে গাছের মূলের ক্ষতি হয় এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অম্ল বৃষ্টিপাতের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি ও সুদূর প্রসারী হতে পারে। অম্ল বৃষ্টিপাতের প্রভাব কোন বিশেষ দেশ বা অম্ল বৃষ্টিপাত সৃষ্টিকারী দেশের মধ্যে সব সময় সীমাবদ্ধ থাকে না। দূরবর্তী দেশসমূহেও অম্ল বৃষ্টিপাত হতে পারে। কারণ অম্ল বৃষ্টিপাত সৃষ্টিকারী এসিড বায়ু প্রবাহের সাথে বহুদূর পর্যন্ত ভেসে যেতে পারে। ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে ব্রিটেন থেকে সুইজারল্যান্ড পর্যন্ত অম্ল বৃষ্টিপাতের বিস্তার ঘটতে পারে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহে অম্ল বৃষ্টিপাতজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে।

গ্রীণ-হাউস প্রতিক্রিয়া বায়ু দূষণের একটি অন্যতম ক্ষতিকর প্রভাব। পৃথিবীতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খনিজ জ্বালানির ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে। এর ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। এছাড়াও গাছ নিধন, গাছপালা ও জৈব পদার্থের পচনের ফলেও বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলে সঞ্চিত হচ্ছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ু মন্ডলে ক্রমাগত জমা হচ্ছে এবং অবরুদ্ধ থাকছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৮৫০ সালে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২৮০-২৯০ পিপিএম যা বর্তমানে প্রায় ৩৫০ পিপিএম এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ৫০০-৭০০ পিপিএম হতে পারে।

তবে গ্রীণ-হাউস প্রতিক্রিয়ার জন্য ক্লোরোফ্লুরো কার্বনকেও দায়ী করা হয়। ক্লোরোফ্লুরো কার্বন এ্যারোসল, বিভিন্ন প্রকারের শীতাতাপ ও হিমায়ক যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। ক্লোরোফ্লুরো কার্বন পৃথিবীর তাপমাত্রাকে আটকে রাখে, যার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বায়ুমন্ডলের যে ওজোন স্তর সূর্য কিরণের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে পৃথিবীর জৈবিক জীবনকে রক্ষা করে, সেই ওজোন স্তর অপসৃত হওয়ার জন্য ক্লোরোফ্লুরো কার্বনকে দায়ী করা হয়। এই ওজোন স্তর সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মিকে শুষে নিয়ে পৃথিবীকে অতি বেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। পৃথিবীতে অতি বেগুনি রশ্মি বেড়ে গেলে মানুষের চামড়ার ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওজোন গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস পেলে বায়ুমন্ডলের উচ্চস্তরের তাপমাত্রা কমে গিয়ে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন আনতে পারে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. উন্নত বিশ্বের দেশগুলিতে বায়ু দূষণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি কি?
২. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বায়ু দূষণ বৃদ্ধির কেন আশংকা করা হচ্ছে?
৩. মোটরযান থেকে যে সমস্ত দূষক বায়ুতে মিশছে সেগুলো কি কি ?
৪. নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড কি ক্ষতি সাধন করে?
৫. বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড বাড়লে কি ধরনের অসুখ হতে পারে?
৬. বায়ুতে সীসা দূষণের ফলে কি ধরনের রোগ হয়?
৭. সালফার-ডাই-অক্সাইড মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর কি ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে?
৮. রেফ্রিজারেটর ও এ্যারোসল থেকে কি গ্যাস নির্গত হয়?
৯. বর্জ্য ও আবর্জনা পোড়ানো দূষক মানুষের কি ধরনের ক্ষতি করে?
১০. অম্ল বৃষ্টিপাতের ক্ষতিকর প্রভাব কি?
১১. গ্রীণ-হাউস প্রতিক্রিয়া কি?
১২. গ্রীণ-হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে কি হয়?
১৩. ওজোন স্তর কমে গেলে বায়ুমন্ডলে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে?

উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলে আপনার বায়ু দূষণ সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা জন্মাবে। ধারণাটি আরও স্পষ্ট হওয়ার জন্য নিচের সারাংশটি পড়ুন।

বায়ু দূষণ পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান একটি কারণ। বিভিন্ন পরিবহন যান, কলকারখানা, বাড়িঘর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি দহন থেকে নির্গত বিভিন্ন গ্যাসীয় দূষক পদার্থ বায়ুমন্ডলে দীর্ঘকাল

ধরে জমা হতে থাকে যার ফলে বায়ু বায়ু দূষক দ্বারা ভারি ও দুষিত হয়। বায়ু দূষণের ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে অম্ল বৃষ্টিপাত ঘটে। তা শুধু শিল্পোন্নত দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বায়ু প্রবাহের সাথে দূষক বায়ু প্রবাহিত হয়ে বহু দূর দেশেও তা ঘটতে পারে। এছাড়াও বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের পরিমাণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বায়ু দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব মানুষ, অন্যান্য প্রাণীকুল, গাছপালা, ফসল ইত্যাদির উপর পড়ছে। বায়ু দূষকের প্রভাবে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র, দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন মারাত্মক ঘাতক ব্যাধি, যেমন ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগ বিস্তার লাভ করছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বায়ু দূষণ গাছপালার বৃদ্ধি ব্যাহত করে; গাছপালা, ফলমূল, শস্য ইত্যাদির উৎপাদনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

পানি দূষণ (Water Pollution) :

মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও অন্যান্য কারণে প্রতিনিয়ত পানি দূষিত হচ্ছে। দূষক দ্বারা পানির স্বাভাবিক প্রাকৃতিক চক্র ব্যাহত হয়ে পানির সহজাত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিনষ্ট হয়ে পানি দূষণ হয়। এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে মানুষ, পানিতে বিচরণকারী প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগতের উপর।

পানি দূষণ অধিক লোকসংখ্যা অধ্যুষিত শহরগুলোর একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সমস্ত শহরগুলোতে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত পানি ক্লোরিন দিয়ে বিশুদ্ধ করা হলেও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, পানির মধ্যে উচ্চ মাত্রায় বর্তমান প্রাণিজ জৈবিক পদার্থ ক্লোরিনের পানি বিশুদ্ধকরণ প্রভাব থেকে ভাইরাসসমূহকে রক্ষা করে। ক্লোরিন দ্বারা বিশুদ্ধ পানি কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। যুক্তরাষ্ট্রের হেপাটাইটিস রোগের আশংকাজনক বিস্তার শৌচাগারের পানি ক্লোরিনের দ্বারা বিশুদ্ধ করে খাবার পানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পানি ক্লোরিন দ্বারা বিশুদ্ধ করার প্রধান সমস্যা হলো কিছু ক্লোরিন মিশ্রণ আছে যা ক্লোরিনায়ন প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় এবং পানির বিকার ঘটায়। এছাড়াও বড় বড় শহরগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে পানি সহজেই বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। নদী তীরবর্তী শহরের পয়:নিষ্কাশন সাধারণত নদীর মাধ্যমে হয়ে থাকে। ফলে নদীর পয়:নিষ্কাশন ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে পানি অতি মাত্রায় দূষিত হয়ে পড়ে।

পানি দূষণ প্রধানত তিনভাবে হয়ে থাকে-

ক. নর্দমায় নিষ্কাশিত আবর্জনা দ্বারা;
খ. কৃষিজাত নিষ্কাশন দ্বারা;
গ. শিল্প বর্জ্য পদার্থ দ্বারা;
ঘ. ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দ্বারা দূষণ।

ক. নর্দমায় নিষ্কাশিত আবর্জনা দ্বারা দূষণ (Pollution by the Waste in Drains):

নর্দমার আবর্জনায় প্রাণী ও উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে যা জমা হয়ে ক্রমশ পচতে থাকে। এই পচন প্রক্রিয়ায় প্রচুর অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। ফলে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। এর ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারে না। এছাড়াও ব্যবস্থাকৃত আবর্জনায় রাসায়নিক পদার্থ নাইট্রেট ও ফসফেটসমূহ জমা হয় যেগুলো এলগি নামক এককোষ বিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বিকাশে সাহায্য করে। এলগিসমূহ যেমন তাড়াতাড়ি বাড়ে তেমনি তাড়াতাড়ি বিনষ্ট ঘটে। এদের পচন প্রক্রিয়ায় প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।

পানির পুষ্টি উপাদানসমূহ মূলত ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন যাদের অধিকমাত্রার অবস্থান ব্যাপক আকারে এলগি বা শৈবাল, Macrophytes জাতীয় উদ্ভিদের জন্ম দেয়। Macrophyte (কলমি লতাসহ বিভিন্ন প্রকার শাক) পানি থেকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান শুয়ে নেয় যা খাবার হিসেবে মানুষের পরিপাকতন্ত্রে জমা হয়ে রোগের বিস্তার ঘটায়।

খ. কৃষিজাত নিষ্কাশন দ্বারা দূষণ (Pollution Through the Drianage of Agricultural Wase):

কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কীটনাশক, নাইট্রেট এবং অন্যান্য রাসায়নিক সার বিভিন্ন মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জলাশয়ের পানিকেই শুধু দূষিত করে না, ভূগর্ভস্থ পানিকেও দূষিত করে। এই পানি বিশুদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব। এর ফলে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন হেপাটাইটিস, আমাশয় ইত্যাদি। পানিতে বিভিন্ন রাসায়নিক মিশ্রণ শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর একটি স্বাস্থ্যশূল হলো পানিতে নাইট্রেট দূষণ। বর্তমান যুগে কৃষিতে নাইট্রেট অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয় যা বিভিন্নভাবে পানির সাথে মিশে যায় এবং

শস্যের মধ্যেও অধিকমাত্রায় জমা হয়। নাইট্রেট যদিও খুব একটা ক্ষতিকারক নয়, তবে যদি কোন জীবাণু পরিপাকতন্ত্রে থেকে যায় তবে জীবাণুগুলো নাইট্রেটকে বিষাক্ত নিট্রাইট (Nitrites) এ পরিণত করে। এছাড়াও কোন খোলা পাত্রে রক্ষিত খাদ্যে নাইট্রেটস নিট্রাইটসে পরিণত হতে পারে যা গৃহপালিত পশু এবং শিশুদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। শিশুদের রক্ত প্রবাহে নাইট্রেট শোষিত হলে অক্সিজেন বহনকারী লাল রক্ত কণিকায় বিক্রিয়া করে। ফলে মেথোমোগ্লোবিন (Methomoglobin) সৃষ্টি হয়। যার ফলে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং মেথোমোগ্লোবিনেমিয়া (Methomoglobinemia) রোগের জন্ম হয়। এই রোগ হলে শ্বাসকষ্ট হয় যা শ্বাসরোধে রূপান্তরিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্য উপত্যকা অঞ্চলে, যেমন উইসকনসিন, মিশৌরী, ইলিনয়ে শিশুদের মধ্যে এই রোগ বিস্তার লাভ করেছে। এলগিন শহর এবং মিনেসোটায় পানিতে নাইট্রেট দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ নতুন পানির উৎস বের করতে বাধ্য হয়েছে।

গ. শিল্প বর্জ্য পদার্থ দ্বারা দূষণ (Pollution by Industrial Waste) :

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্প কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ শিল্পের অবস্থান সাধারণত পানির উৎসের নিকটে হয়ে থাকে। শিল্প কারখানা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প বর্জ্য, যেমন লেদ, সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোফ্লুরিক এসিড, ফেনল, ইথার, বেনজিন, এমোনিয়া ইত্যাদি পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে পানি দূষণ করে। এগুলো দ্বারা শুধু নদী,হ্রদ, সমুদ্র তীরবর্তী পানি দূষিত হয় না, মাটি চুঁইয়ে ভূগর্ভস্থ পানিতে মিশে ভূগর্ভস্থ পানিকেও দূষণ করে। শিল্পের রাসায়নিক বর্জ্য দ্বারা পানি দূষণের ফলে বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয় এবং পরিবেশে ভারসাম্যহীনতা আনে।

ঘ. আর্সেনিক দূষণ (Arsenic Pollution) :

আর্সেনিক স্বাদ গন্ধহীন একটি রাসায়নিক মৌল যা সাধারণত আকরিক হিসেবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। একটি যৌগিক পদার্থের তারতম্যভেদে মানবদেহে মৃদু থেকে প্রবল বিষক্রিয়া ঘটায়। ভূগর্ভস্থ পানি পাম্পের সাহায্যে বেশিক্ষণ উত্তোলন করলে ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে যে মেটালিক আর্সেনিক 'আয়রন পাইরাটস' থাকে তা বায়ু সক্রিয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে বায়ু সক্রিয় অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসা বায়ু অক্সিজেনসমৃদ্ধ পানির সাথে বিক্রিয়ায় 'আর্সেনো পাইরাইট' পকেট সৃষ্টি করে যা একটি দূষণগুচ্ছ (Pollution Plume) সৃষ্টি করতে পারে। আর্সেনিকের যে কোন দ্রবণই বিষাক্ত। অন্যদিকে আর্সেনোপাইরাট খনিজ পদার্থটি থেকে পিটিসাইট (Pitticite) নামক লৌহযুক্ত যৌগটি পানিতে মিশে দ্রবীভূত হয়ে বিষাক্ত আর্সেনিক দ্রবণের সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত নলকূপের পানি উত্তোলনের কারণে আর্সেনিক দূষণ ভূগর্ভে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে।

আর্সেনিক প্রতিক্রিয়া মানবদেহে খুব ধীরে প্রকাশ পায়। প্রথমে কোন কিছুই ধরা পড়ে না। দীর্ঘদিন মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষিত পানি খেলে চর্মরোগ, যকৃতের স্ফীতি, রক্তশূন্যতা, অগ্নিমান্দ্য বা ক্ষুধা হ্রাস, কানে কম শোনা, চামড়ার ক্যান্সার, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। এছাড়াও যকৃতের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া, স্নায়ুবৈকল্য দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আর্সেনিক দূষণ অঞ্চলগুলো অবস্থিত। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক দূষণের কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন বদ্বীপ বা গঙ্গা অববাহিকার পলল ভূগঠন প্রক্রিয়ায় 'আর্সেনোপাইরাইট' শিলাস্তর লাখ লাখ বছর আগে জমা হয়েছিল। সেচের জন্য অত্যধিক ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের দরুন এই শিলাস্তর ক্ষয় হয়ে পানিতে আর্সেনিক মিশেছে। গঙ্গাবাহিত লৌহ অক্সাইডযুক্ত পললে রয়েছে অস্বাভাবিক মাত্রায় আর্সেনিক। বিশেষজ্ঞগণ খাবার ও সেচের জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনকেই পানিতে আর্সেনিক দূষণের জন্য দায়ী করছেন। আবার পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক সারের ব্যবহারকেও আর্সেনিক দূষণের জন্য দায়ী করেছেন।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. দূষক পানির কি বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করে?
২. পানি দূষণ কোন অঞ্চলে প্রধানত হয়ে থাকে?
৩. দূষিত পানি কি উপায়ে বিশুদ্ধ করা হয়?
৪. ক্লোরিন দ্বারা বিশুদ্ধ পানি অনেক ক্ষেত্রে পানের অনুপযুক্ত কেন?
৫. যুক্তরাষ্ট্রে হেপাটাইটিস রোগের বিস্তার কি কারণে হয়েছে?
৬. বড় বড় শহরগুলোর নদীর পানি কি ভাবে দূষিত হচ্ছে?

৭. পানি দূষণ কি কি ভাবে হয়ে থাকে?
৮. নর্দমার আবর্জনার পচন প্রক্রিয়ায় কি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়?
৯. অক্সিজেনের অভাব জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর কি প্রতিক্রিয়া ফেলে?
১০. পানিতে জন্মানো শাক কি ভাবে রোগের বিস্তার ঘটায়?
১১. কৃষিজাত নিষ্কাশন দূষক কি কি ?
১২. নাইট্রেট দ্বারা কি কি রোগ হয়ে থাকে?
১৩. বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প বর্জ্যগুলি কি কি?
১৪. শিল্প বর্জ্য দ্বারা পানি দূষণের প্রতিক্রিয়া কি ?
১৫. আর্সেনিক দূষিত পানি পান করলে মানুষের কি কি রোগ হতে পারে?

মৃত্তিকা দুষণ (Soil Pollution) :

মাটির উপযুক্ত পরিচর্যা না করার কারণে মাটি দুষণ মারাত্মক সমস্যা হিসেবে বিশ্বব্যাপী গণ্য হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি মৃত্তিকা দূষণকে ত্বরান্বিত করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্য উৎপাদন ও অন্যান্য কর্মকান্ড বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের অধিকাংশ কর্মকান্ড প্রধানত ভূমিনির্ভর। ফলে ভূমির বিভিন্ন ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে ভূমির উপর অত্যধিক চাপ পড়েছে যা কোন কোন ক্ষেত্রে ভূমির বহন ক্ষমতা মাত্রা অতিক্রম করেছে।

মাটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং ক্ষয়ীভবন (Soil Erosion) মৃত্তিকা দূষণের ফলে হয়ে থাকে। মাটির ক্ষয়ীভবন বা ক্ষয়ের ফলে মাটি আলগা হয়ে যায়। গাছপালা, ঘাস, তৃণাদি ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করলে মাটির ক্ষয় প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। মাটি আলগা এবং অনাবৃত থাকলে বাতাস মাটিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ফলে মাটির গুণাগুণের পরিবর্তন ঘটে। এছাড়াও বৃষ্টি ও বন্যা মাটি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে অপসারিত করে। মাটির ক্ষয় সাধন এবং অপসারণ এই দুই প্রক্রিয়ায় মাটি ক্রমাগত অনুর্বর হয়ে পড়ে এবং সামগ্রিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়। গাছপালা লাগিয়ে মাটির অপসারণ দূর করা সম্ভব।

অধিক উৎপাদনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার মাটির উর্বরতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। মাটিতে জৈব পদার্থের অভাব হলে মাটি উর্বরতা হারায়। মাটিতে পচা গাছ-গাছড়া এবং জন্তু-জানোয়ারের গলিত পদার্থ সংমিশ্রণে 'হিউমাস' বা পচা সার গঠিত হয়। ব্যাকটেরিয়া হিউমাস ক্ষয় করে এবং নাইট্রেট, ফসফেট এবং অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদানে বিভক্ত করে। গাছের জন্য এসব পুষ্টি উপাদান বাড়ন্ত ফসলকে খাদ্য যোগায়। তবে অতিরিক্ত এবং উন্নতমানের ফসল উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহার হিউমাস বিভক্তিকরণ ক্ষমতা হ্রাস করে এবং পুষ্টি উপাদানের কার্যকারিতা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।

শস্যক্ষেত্রে পোকামাকড় ও আগাছা ধ্বংসকারী কীট ও আগাছা নাশকের ব্যবহার বর্তমানে অধিকমাত্রায় হয়ে থাকে। এই সমস্ত কীটনাশক পোকামাকড় যেমন ধ্বংস করে তেমনি মানুষের বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষতি সাধন করে। কীটনাশক ক্লোরিনেটেড হাউড্রোকার্বনের (Chlorinated Hydrocarbons) উপাদানগুলোর মধ্যে DDT দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে থেকে কৃষিজমিতে পোকামাকড় নিধনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এক সময় DDT উচ্চমাত্রায় সরাসরি শস্য ক্ষেতে ব্যবহার করা হতো। DDT শুধু পোকামাকড়ই ধ্বংস করে না, মানুষের উপরও এর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। একটি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের চর্বিতে DDT মাত্রার সাথে মৃত্যুর একটি সম্পর্ক রয়েছে। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে, যে সমস্ত রোগী ঘিলু তরল হয়ে মস্তিষ্কে রক্ষক্ষরণ, উচ্চ রক্তচাপ, লিভার সিরোসিস এবং বিভিন্ন ক্যান্সারে মারা গিয়েছে, তাদের চর্বিতে DDT এবং DDT থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন উপাদান উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ছিল। এছাড়াও মানুষের শরীরে DDT-র আরও বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। DDT ছাড়াও শস্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত অন্যান্য কীট ও আগাছানাশক বিভিন্ন মাত্রায় মানুষের ক্ষতি করে। এই সমস্ত কীট ও আগাছা নাশক শস্যের জন্য ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও আগাছা ধ্বংসের সাথে সাথে শস্য ও মাটির জন্য উপকারী পোকামাকড় ও আগাছাও ধ্বংস করে ফেলে যার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া বাস্তব্যরীতির উপর পড়ে। এছাড়া অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার মাটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী ধ্বংস করে ফেলে এবং সমগ্র এলাকার বাস্তব্যরীতির পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. মৃত্তিকা দূষণের কারণগুলো কি কি?
২. মাটি ক্ষয় ও অপসারণের ফলে মাটির কি অবস্থা ঘটে?
৩. মাটি অপসারণ কি ভাবে দূর করা সম্ভব ?
৪. দীর্ঘদিন ধরে জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার জমির কি ক্ষতি করে?
৫. 'হিউমাস' কি ? হিউমাস বিভক্তিকরণ কেন ফসলের জন্য উপকারী ?
৬. শস্যক্ষেত্রে অধিক কীট নাশকের ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া কি?
৭. DDT মানুষের কি ক্ষতি সাধন করে ?

পাঠসংক্ষেপ :

বিভিন্ন প্রকারের পরিবেশ দূষণকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়-বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ও মাটি বা মৃত্তিকা দুষণ। এছাড়াও আরও বিভিন্ন প্রকারের দূষণ রয়েছে যা পরিবেশের প্রভূত ক্ষতি করে।

বায়ু দূষণ পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান একটি কারণ। বিভিন্ন পরিবহন যান, কলকারখানা, বাড়িঘর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার জ্বালানী দহন থেকে নির্গত বিভিন্ন গ্যাসীয় দূষক পদার্থ বায়ুমন্ডলে দীর্ঘকাল ধরে জমা হতে থাকে যার ফলে বায়ু দূষক দ্বারা ভারি ও দূষিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পৃথিবীব্যাপী পানি দূষণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এমনও ধারনা করা হচ্ছে যে এক সময় বিশুদ্ধ পানি পাওয়া অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য ব্যাপারে পরিণত হবে। পানি প্রধানত চার প্রকারে দূষণ হয়, নর্দমায় নিষ্কাশিত আবর্জনা দ্বারা, কৃষিজাত নিষ্কাশন দ্বারা, শিল্প বর্জ্য পদার্থ দ্বারা এবং আর্সেনিক পদার্থ দ্বারা (আর্সেনিক দূষণ)।

নর্দমায় নিষ্কাশিত আবর্জনায় প্রাণী ও উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থের পচনে অধিক মাত্রায় অক্সিজেনের ব্যবহারে পানিতে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় যা জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের বাঁচার জন্য দরকার। আবার ব্যবস্থাকৃত আবর্জনায় নাইট্রেট ও ফসফেট এলগির জন্ম দেয় যাদের পচন প্রক্রিয়ায় প্রচুর অক্সিজেন নি:শেষ হয়। এছাড়াও ফসফরাস ও নাইট্রোজেন ম্যাকক্রোফাইটস এর জন্ম দেয়। এরা পানি থেকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান শুয়ে নেয় যা খাবার হিসেবে মানুষের পরিপাকতন্ত্রে জমা হয়ে রোগের বিস্তার ঘটায়।

কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কীটনাশক, রাসায়নিক সার, নাইট্রেট ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠের এবং ভূ-অভ্যন্তরের পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে পানি দূষণ করে। নাইট্রেট নিট্রাইটসে পরিণত হলে গৃহপালিত পশু ও শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি মারাত্মক হুমকিরূপে দেখা দেয়। শিল্প বর্জ্য থেকে রাসায়নিক পদার্থ জলাশয়ের পানির সাথে মিশে এবং মাটি চুঁইয়ে ভূগর্ভস্থ পানিকে দূষিত করে যা মানুষের শরীরে নানাভাবে বৈকল্য আনে এবং পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা আনে। আর্সেনিক দূষণ বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে। আর্সেনিক দূষণের ফলে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মাটির উপর বিভিন্নভাবে চাপ পড়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মাটির বহন ক্ষমতা মাত্রা অতিক্রম করেছে যা সামগ্রিক বাস্তব্যরীতির পরিবর্তন আনছে। মৃত্তিকা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দূষণ হয়। অধিক উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার কীট ও আগাছা নাশকের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবহার মৃত্তিকার ক্ষতি সাধন করে। ফলে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়, মাটির ক্ষয়ীভবন শুরু হয় এবং বিভিন্নভাবে মাটি অপসারিত হয়। ফলে মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ে। মাটিতে জৈব পদার্থের অভাব হলেও মাটি উর্বরতা হারায়। জৈব পদার্থ হিউমাস সৃষ্টি করে এবং মৃত্তিকার পুষ্টি রক্ষা করে। রাসায়নিক সার হিউমাসের কর্মক্ষমতা হ্রাস করে। কীট ও আগাছানাশক শস্যের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় ও আগাছা ধ্বংস করা ছাড়াও শস্য ও মাটির জন্য উপকারী পোকামাকড় ও গুল্মলতা নষ্ট করে, যার ফলে বাস্তব্যরীতির সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে এবং মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রোগব্যধির জন্ম দেয়। এছাড়াও অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের ফলেও মৃত্তিকার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা দূষণ হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ : ৬.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓)চিহ্ন দিন (সময় ৪ মিনিট) :

১.১ পরিবেশ কিসের সমন্বয়ে গঠিত ?
ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ খ. মানবিক পরিবেশ গ. প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশ

১.২ বিশ্বে বায়ু দুষণের পরিমাণ কি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে?
ক. মোটরযানের সংখ্যা বৃদ্ধি খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি গ. নগরায়ন

১.৩ জ্বালানি পোড়ানো ধোঁয়া উদ্ভিদের কি ক্ষতি করে?
ক. বৃদ্ধি রোধ করে খ. সালোক সংশ্লেষণ ক্ষমতা হ্রাস করে গ. ধ্বংস করে

১.৪ গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়ার জন্য কোন গ্যাসকে দায়ী করা হয়?
ক. কার্বন-ডাই-অক্সাইড খ. সালফার-ডাই-অক্সাইড গ. নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড।

২. শূন্যস্থান পূরণ করুন (সময় ১৬ মিনিট):

২.১ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও অন্যান্য কারণে প্রতিনিয়ত .....দুষিত হচ্ছে ।

২.২ .....দ্বারা বিশুদ্ধ পানি কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

২.৩ পানিতে বিভিন্ন রাসায়নিক মিশ্রণ শরীরে .....সৃষ্টি করে।

২.৪ অতিরিক্ত নলকূপের পানি উত্তোলনের কারণে .....দূষণ ভূগর্ভে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে।

২.৫ মাটির উপযুক্ত .....না করার কারণে মাটি দূষণ মারাত্মক সমস্যা হিসেবে বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়েছে।

২.৬ মাটির .....সাধন ও .....এই দুই প্রক্রিয়ায় মাটি ক্রমাগত অনুর্বর হয়ে পড়ে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর (সময় ২০ মিনিট):

১. পরিবশে দূষণ কাকে বলে ?
২. চোখের জন্য কি ক্ষতিকারক?
৩. কার্বণ মনোক্সাইড কি ক্ষতি করে?
৪. বর্জ্য ও আবর্জনা পোড়ানো থেকে কি উত্থিত হয় এবং মানুষের কি ক্ষতি করে?
৫. বায়ু মন্ডলের ওজোন স্তর অপসারিত হওয়ার জন্য কোন গ্যাসকে দায়ী করা হয়?
৬. পানি দূষণ প্রধানত কত প্রকারে হয়ে থাকে এবং কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বায়ু দূষণ কি কি প্রকারে হয়ে থাকে ? বায়ুদূষণজনিত রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
২. পানি দূষণের প্রধান নিয়ামকসমূহ কি কি ? দূষণযুক্ত পানি গ্রহণে কি ধরনের রোগ হয় ?
৩. মৃত্তিকা দূষণের প্রকৃতি আলোচনা করুন ।

পাঠ-৬.৪

অন্যান্য দূষণ মাধ্যম

এ পাঠ পড়ে আপনি-

◆ বিভিন্ন দূষণের ফলে মানুষ, জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের ক্ষতি ও রোগব্যাধি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

কঠিন বর্জ্য দূষণ (Solid Waste Pollution) :

কঠিন বর্জ্য দূষণ নগর সভ্যতার একটি অবদান। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর শহরাঞ্চলের উন্মুক্ত প্রান্তরে অথবা নিচু জমিতে কঠিন বর্জ্য পদার্থ ফেলা হয়। উন্নয়নশীল ক্রমবর্ধমান শহরগুলোতে বর্জ্য ধ্বংস করার সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কঠিন বর্জ্য পদার্থ যত্রতত্র ছড়ানো ছিটানো বা স্তুপাকার হয়ে থাকে। এই কঠিন বর্জ্য পদার্থের অধিকাংশই গৃহজাত ব্যবহারের অনুপযুক্ত ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বা গৃহজাত দ্রব্যাদির অংশবিশেষ। এছাড়াও অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে দ্রব্যাদি বহনকারী পলিথিন একটি প্রধানতম সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে যা বিভিন্ন পরিবাহ ব্যবস্থাকে অনেক ক্ষেত্রে অচল করে ফেলে।

এই সমস্ত কঠিন বর্জ্য পদার্থ শহরের শুধু সৌন্দর্যহানিই ঘটায় না, এগুলো থেকে বায়ু দূষণ, পানি চুঁইয়ে ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ এবং বিভিন্ন অসুখ পরিবাহন উৎস, যেমন ইঁদুর, তেলাপোকা, মাছির জন্মস্থান হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বছর ৫৫ বিলিয়ন ক্যান, ২৬ বিলিয়ন বোতল ও পানির পাত্র (Jar), ৬৫ বিলিয়ন ধাতব এবং প্লাস্টিকের বোতলের ছিপি এবং প্রায় অর্ধ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরনের প্যাকিং এর মোড়ক জমা হয়। এছাড়াও ৭ মিলিয়ন ভাঙ্গা মোটরগাড়ী আবর্জনাস্থলে (Junkyard) জমা হয়। এর উপরও আরও বিভিন্ন ধরনের কঠিন বর্জ্য তো রয়েছেই।

শিল্পাঞ্চলে অথবা খনিজ অঞ্চলে স্টীল ও লোহার খন্ড, পাথরের খন্ড, বিভিন্ন ধাতু, ছাই ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ প্রতিনিয়ত জমা হচ্ছে যা পরিবেশকে বিভিন্নভাবে দূষণ করছে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

১. কঠিন বর্জ্য দূষক পদার্থগুলি কি কি?
২. কঠিন বর্জ্য পদার্থ দ্বারা কি ভাবে পরিবেশ দূষণ হয়?

শব্দ দূষণ (Noise Pollution)

পরিবেশ দূষণে শব্দ দূষণ একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ বড় বড় শহরে শব্দ দূষণ একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মোটর গাড়ি, ট্রাক, বাস, মিনিবাস, মোটরের হর্ণ, কলকারখানা ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ যখন মানুষের শ্রবণ ক্ষমতার উপর চাপ সৃষ্টি করে তখন তাকে শব্দ দূষণ বলে অভিহিত করা হয়। দূষণ বলা হচ্ছে এই কারণে যে, শব্দের প্রচন্ডতায় মানুষের কান ও শ্রবণশক্তিজনিত বিভিন্ন অসুখ ছাড়াও অন্যান্য অনেক মারাত্মক অসুখ হয়ে থাকে। শব্দ সাধারণত ডেসিবেলে (Decibels) মাপা হয়। শব্দ দূষণ প্রথম একটি দূষণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যখন কিছু অপ্রাপ্তবয়স্ক উচ্চ ধ্বনিসম্পন্ন রক মিউজিক দীর্ঘদিন শোনার কারণে সম্পূর্ণেরূপে বধির হয়ে যায়। স্বল্প সময়ের জন্য তীক্ষ্ণ শব্দও সাময়িক বধিরতা আনতে পারে। শব্দ দূষণ থেকে বিভিন্ন নার্ভের উপর চাপ সৃষ্টিকারী রোগব্যাধির জন্ম হয়, যেমন স্নায়ুবিক দৌর্বল্য, উচ্চ রক্তচাপ, পেপটিক আলসার, এমনকি আত্মহত্যা করার প্রবণতা ইত্যাদি। কাজেই দেখা যাচ্ছে শব্দ দূষণ মানুষের স্বাস্থ্য ও হাসিখুশি জীবনযাপনের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান হুমকি রূপে দেখা দিয়েছে। অনেকের হিসাব অনুযায়ী উত্তর আমেরিকার দেশগুলোতে প্রতি দশ বছরে গড় শব্দের প্রচন্ডতা দ্বিগুণ হচ্ছে। শব্দ দূষণ তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোতে ক্রমাগত হারে বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের অধিক লোকসংখ্যা অধ্যুষিত বড় বড় শহর এবং বাণিজ্যিক শহরগুলোতে শব্দ দূষণের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এ অবস্থায় শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সবিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. শব্দ দূষণ কাকে বলে?
২. শব্দকে কেন দূষণ বলা হচ্ছে?

পলিথিন দূষণ (Polythene Pollution)

পলিথিন বর্তমান সভ্যতার একটি অন্যতম অবদান। পলিথিনের ব্যাগ গৃহস্থালী, ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে দ্রব্যাদি বহন এবং রক্ষণের জন্য অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে এবং লোকজনের কাছে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। কিন্তু পলিথিন সহজে ধ্বংস হয় না এবং মাটির সাথে মিশেও যায় না।

পলিথিন বর্তমান পরিবেশকে বিভিন্নভাবে দূষণ করছে। মাটিতে পলিথিন সহজে মিশে না যাওয়ার কারণে যে সমস্ত জায়গায় ব্যবহৃত পলিথিন ফেলা হচ্ছে সেই সমস্ত জায়গার মাটির দৃঢ়বদ্ধতা ব্যাহত হচ্ছে। এই সমস্ত জমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ অনেক ক্ষেত্রে আশঙ্কাজনক। এছাড়াও পলিথিন মিশ্রিত মাটি পুষ্টি হারাচ্ছে।

নগর সভ্যতায় পলিথিন একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে অনুন্নত বিশ্বের বড় বড় শহরগুলোতে পলিথিন অপসারণের সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে পলিথিন নর্দমা, পয়:নিষ্কাশন নালীতে জমে। এই সমস্ত পলিথিন ময়লা পানি নিষ্কাশনে বাঁধার সৃষ্টি করে। ফলে পয়:নিষ্কাশনে এবং নর্দমার পানি উপচে শহরে দূষিত পানির জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বন্যার সময় পানি সহজে সরতে পারে না। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে বন্যার পানি অপসারণের দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম কারণ নর্দমা এবং পয়:নালীতে পলিথিন জমে যাওয়া। এছাড়াও পলিথিন ধ্বংস করার জন্য পলিথিন পোড়ালে পলিথিন পোড়ানো থেকে উত্থিত গ্যাস বায়ুকে দূষণ করে। কাজেই পলিথিনকে বর্তমানে পরিবেশ দূষণের অন্যতম উপাদান হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

সমগ্র পাঠটির উপর নিচে একটি সারাংশ দেওয়া হলো। সারাংশটি পড়ে পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে আপনার ধারণাটি পরিষ্কার করে নিন।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. পলিথিন কি ভাবে মাটিকে দূষিত করছে?
২. শহরে পলিথিন কি সমস্যার সৃষ্টি করছে?
৩. পোড়ানো পলিথিন থেকে কি উৎপন্ন হয়?

পাঠসংক্ষেপ :

প্রকৃতিতে প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ সম্বলিত যে সামগ্রিক বাহ্যিক অবস্থা তাকে সাধারণভাবে পরিবেশ বলে। তবে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে মানুষের সমগ্র কর্মকান্ডের সমষ্টিগত রূপ।

পরিবেশ মানুষের কর্মকান্ডের দ্বারা প্রতিনিয়ত দূষণ হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের কর্মকান্ড জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া মানুষ ও অন্যান্য জীবের বসবাসকারী পরিবেশের উপর পড়ছে এবং পরিবেশকে দূষণ করছে।

পরিবেশ দূষণ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। বায়ু, পানি, মৃত্তিকা ইত্যাদি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানসমূহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দূষণ হচ্ছে। কঠিন বর্জ্য দূষণ, শব্দ দূষণ, পলিথিন দূষণ বর্তমানে নগর সভ্যতার অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। বায়ু দূষণ মূলত যান্ত্রিক সভ্যতার অন্যতম ফসল। বিভিন্ন প্রকারের পরিবহন, শিল্প-কারখানা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত জ্বালানী দহন থেকে উত্থিত বিভিন্ন প্রকারের বিষাক্ত গ্যাস বায়ুকে প্রতিনিয়ত দূষিত করছে। পানি দূষণ বিভিন্ন মাধ্যমে হয়ে থাকে। নর্দমায় নিষ্কাশিত আবর্জনা, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক নিষ্কাশন, শিল্প বর্জ্য দ্বারা পানি প্রধানত দূষণ হয়। এছাড়াও ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ বর্তমানে একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মৃত্তিকা দূষণ বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার, কীটপতঙ্গ ও আগাছা নাশকের ব্যবহার, অতি চাষ, ভূমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার না হওয়ায় মাটি তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে। এছাড়াও বিশ্বের অত্যধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত বড় বড় শহরগুলোতে কঠিন বর্জ্য দূষণ, শব্দ দূষণ, পলিথিন দূষণ অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব এই সমস্ত দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। কঠিন বর্জ্য দ্বারা মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ হচ্ছে। শব্দ দূষণ কানের বিভিন্ন ব্যধি ছাড়াও অন্যান্য অনেক মারাত্মক ব্যধির কারণ বলে গণ্য হচ্ছে। পলিথিন দূষণে শহরে দূষিত পানির জলাবদ্ধতার কারণে বিভিন্ন রোগব্যাধির জন্মস্থান সৃষ্টি করে এবং রোগ বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও যেখানে সেখানে নিক্ষিপ্ত পলিথিনের ব্যাগ শহরের শুধু সৌন্দর্যহানিই করছে না, শহরের সামগ্রিক পরিবেশকে নষ্ট করছে। উল্লেখিত বিভিন্ন প্রকারের দূষণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগব্যাধি বিস্তারে নিয়ামক হিসাবে ভূমিকা রাখা ছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী অন্যান্য প্রাণী ও কীটপতঙ্গ ধ্বংস করছে যা সামগ্রিক পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

অনুশীলনী :

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। এর ফলে পাঠটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপনার ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

১. বায়ু দূষণ কি কি প্রকারে হয়ে থাকে? বায়ু দূষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. পানি দূষণের প্রধান নিয়ামকসমূহ কি কি? পানি দূষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৩. মৃত্তিকা দূষণ কখন বলা হয়? মৃত্তিকা দূষণের নিয়ামকসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪. কঠিন বর্জ্য দ্বারা পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে লিখুন।

৫. আর্সেনিক দূষণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে লিখুন। বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণের কারণ কি? আর্সেনিক দূষণজনিত রোগব্যাধিগুলোর নাম লিখুন।

৬. শব্দ দূষণ কাকে বলে? শব্দ দূষণ মাপার পরিমাপক কি ? শব্দ দূষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখুন।

৭. পলিথিন কিভাবে পরিবেশ দূষণ করে?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর শহরাঞ্চলের -------- প্রান্তরে অথবা নিচু জমিতে কঠিন বর্জ্য পদার্থ ফেলা হয়।

১.২ পরিবেশ দূষণে .....দূষণ একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

১.৩ শব্দ দূষণ থেকে ..... ওপর চাপ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন রোগব্যাধির জন্ম হয়।

১.৪ পলিথিন মিশ্রিত মাটি ---------- হারাচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর: (সময় ২০ মিনিট):

১. কঠিন বর্জ্য পদার্থ কোনগুলি?

২. উচ্চ ধ্বনিসম্পন্ন রক মিউজিক দীর্ঘদিন শোনার কারণে মানুষের কি রোগ হতে পারে ?

৩. ১৯৯৮ সালে ঢাকা শহরের বন্যার পানি অপসারণের ক্ষেত্রে সময় লাগার কারণ কি এবং কেন সময় লাগে?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. কঠিন বর্জ্য দ্বারা পরিবেশ কিভাবে দূষিত হয় আলোচনা করুন।

পাঠ-৬.৫

প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও মানুষের সমন্বয় কৌশল

(Natural Hazards and Human Adjustment Stretegies)

এই পাঠ পড়ে আপনি-

◆ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাকে বলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃতি, প্রকার ও বৈশিষ্ট্য;
◆ শিল্প পূর্ব ও শিল্পোত্তর প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমন্বয় কৌশল; এবং
◆ দুর্যোগকালীন, দুর্যোগ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে মানুষের বিভিন্ন দুর্যোগ সমন্বয় কৌশল সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Natural Hazards)

সাধারণভাবে দুর্যোগ বলতে প্রাকৃতিকভাবে মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা, সম্পদ ধ্বংস, পরিবেশ ধ্বংস এবং এসবের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত চরম ঘটনাবলী, যেমন বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির উদগিরণ, তুষার ধস ইত্যাদিকে বলা হয়। এমনকি ছত্রাক ও ভাইরাসজনিত ব্যাপক আকারে বিস্তৃত রোগব্যধিকেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয়ে থাকে। তবে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে তখনই দুর্যোগ বলে অভিহিত করা হয় যখন প্রাকৃতিক ঘটনাবলী জীবন ও সম্পদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয় বা ক্ষতি করে। কাজেই দুর্যোগ একটি হুমকিস্বরূপ। দুর্যোগসমূহ কোন জনগোষ্ঠীর উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করলে তাকে দুর্যোগ বলা যাবে না, যেমন বন্যাকে কখনোই দুর্যোগ বলা যাবে না যদি না কোন জনগোষ্ঠী প্লাবন ভূমিতে বসবাস করে বা প্লাবন ভূমিকে ব্যবহার করে। দুর্যোগ থেকে বিভিন্ন দূর্ঘটনা, আকস্মিক মহা দূর্ঘটনা, জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্বল্প মেয়াদি হতে পারে, যেমন আকস্মিক বজ্রপাত, আবার ধারাবাহিক বা একটানাও হতে পারে, যেমন উত্তর অক্ষাংশের উচ্চ মাত্রার অতি বেগুনি রশ্মি। কাজেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত সর্বসাধারণ স্বীকৃত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যা জীবন ও সম্পদের প্রভূত ক্ষতি করে।

প্রতি বছর আড়াই লক্ষেরও বেশি জীবন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের দরিদ্র জনসাধারণ এবং ক্রান্তীয় ভূমিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী মোট ক্ষতির পরিমাণ ৪০,০০০ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ ক্ষতির পরিমাণ ২৫,০০০ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার। অবশিষ্টাংশ ব্যয় হয় দুর্যোগ প্রতিরোধে এবং দুর্যোগ প্রশমনে। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে বন্যার দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হয় যার পরিমাণ মোট ক্ষতির ৪০ শতাংশ। ২০ শতাংশ ক্ষতি হয় গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় দ্বারা এবং ১৫ শতাংশ ক্ষতি হয় খরায়। তিন চতুর্থাংশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের উৎপত্তি হয় মূলত জলবায়ুগত কারণে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ক্ষয়ক্ষতির এই বৃদ্ধি জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানুষ পূর্বের তুলনায় অধিক হারে প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণে সচেষ্ট। যার কারণে মানুষ শহরসহ অন্যান্য সুবিধাজনক এলাকায় কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সম্পদের প্রাচুর্যও কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই সমস্ত এলাকা যত অধিক মাত্রায় প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত হচ্ছে, ধ্বংসের মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বাড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মানুষ ক্রমাগত দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বসবাসে বাধ্য হচ্ছে। এই কারণেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী নিশ্চিত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসলেও বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলের জনসংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ উপকূলীয় অঞ্চলের উর্বরা কৃষি ভূমি এবং মূল ভূখন্ডে অত্যধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব। ফলে উপকূল অদূরবর্তী নতুন জেগে উঠা অদৃঢ় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলোতে পর্যন্ত মানুষ অধিক পরিমাণে বসবাস শুরু করেছে। বাংলাদেশের দূর্বল অর্থনীতির কারণে যথোপযুক্ত দুর্যোগ প্রতিরোধমূলক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার করা সম্ভব না হওয়ায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে অধিক পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়।

কাজেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃতি ও প্রভাব প্রকৃতির বিশেষ অবস্থা এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সমাজ ব্যবস্থার সাথে মিথস্ক্রিয়ায় ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটন অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করছে মানুষ কিভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করছে তার উপর। যেমন খরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও যথেচ্ছ বৃক্ষ নিধন খরার জন্য অনেকাংশে দায়ী। কারণ বৃক্ষ শিকড়ের মাধ্যমে পানি মাটিতে ধরে রাখে এবং খরা প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে। আবার যেখানে সেখানে বাঁধ নির্মাণ, জলাশয়সমূহ ভরাট ও মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নদী তলদেশ ভরাট হলেও বন্যা হতে পারে। উৎপত্তিগত কারণ ও বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ বেশ কিছু অঞ্চল রয়েছে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. দুর্যোগ বলতে কি বোঝায়?
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে কি বোঝায়?
৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়?
৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশ্বের ক্ষতির পরিমাণ কত?
৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি কিসের দ্বারা হয়?
৬. ঘূর্ণিঝড় দ্বারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতির পরিমাণ কত?
৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি কি কারণে বাড়ছে?
৮. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশী কেন?
৯. প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃতি ও প্রভাব কি কি বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত এবং কি ভাবে?

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকার (Types of Natural Hazard)

ভূগোলবিদগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে মূলত ভূপ্রাকৃতিক (জলবায়ু ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক) ঘটনাসমূহকে গণ্য করেন। তবে বার্টন এবং কেট্স (Burton and Kates, 1964) প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে উৎসভিত্তিক ভূপ্রাকৃতিক ও জৈবিক এই দুই প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

বার্টন ও কেট্স অনুসারে উৎসভিত্তিক প্রধান সর্বজনীন প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ

ভূ-প্রাকৃতিক		জৈবিক	
জলবায়ু ও আবহাওয়া বিষয়ক	ভূতাত্ত্বিক ও ভূমিকম্প বিষয়ক	উদ্ভিদকূলীয়	প্রাণীকূলীয়
তুষার ঝড়, তুষার, খরা, বন্যা, কুয়াশা, তুহিন, শিলাবৃষ্টি, তাপ তরঙ্গ, সাইক্লোন, বিদ্যুৎ প্রবাহ, আঘাত ও অগ্নিকান্ড, টর্ণেডো।	হিমানী সম্প্রপাত ভূমিকম্প, ভূমিক্ষয়, ভূমিধস, পরিবর্তনশীল বালুকারাশি, সুনামী, আগ্নেয়গিরি।	ছত্রাকজনিত রোগ, এ্যাথলেটস ফুট, ডাচ এল্ম, হুইট স্টেম রাস্ট, ধসা বা খসা রোগ, ইনফেস্টেশন, কচুরীপানা, উদ্ভিদ থেকে সৃষ্টি বিভিন্ন সর্দি কাশিজনিত জ্বর, বিষাক্ত উদ্ভিদ।	ব্যাকটেরিয়া ও বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগ, উদাহরণ: ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, টাইফাস, বাবনিক প্লেগ, রতিজ রোগ, খুর ও গালের রোগ, টবাকো, মোসাইক। ইনফেস্টেশন, উদাহরণ: র‍্যাবিট্স, উইপোকা, পঙ্গপাল, ফড়িং, বিষাক্ত প্রাণীর কামড়।

উৎস: ইসলাম, এম. আ.(১৯৯৮) "সম্পদ ব্যবস্থাপনা" বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দুর্যোগে মানুষের সমন্বয় কৌশল (Natural Hazards Adjustment Strategies)

প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের সমন্বয় কৌশলগুলোকে সময় অনুসারে প্রধানত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়-
(ক) শিল্পপূর্ব
(খ) শিল্পোত্তর।

(ক) শিল্পপূর্ব সমন্বয় কৌশল (Pre-industrial Adjustment Strategies)

শিল্পপূর্ব সমাজে দুর্যোগ সমন্বয় কৌশল ছিল অতি সাধারণ। সে যুগে দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিবেশ প্রত্যক্ষণের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এছাড়াও মানুষের জীবনাচরণ, দুর্যোগ মোকাবেলার অতীত এতিহ্য বা ইতিহাস, গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদিরও দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা ছিল। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে নিজেদের আচরণের পরিবর্তন করে মানুষ প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে বা সহাবস্থানের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা করতো। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার সমন্বয়নের উদ্ভব ঘটেছে যা এখনও পৃথিবীর বহু দেশে প্রচলিত রয়েছে, যেমন বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, চীন প্রভৃতি দেশে। চীনে প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও পূর্ব থেকে বন্যা প্রতিরোধে জমিতে আইল বা Dyke নির্মাণ প্রচলিত রয়েছে। কৃষি প্রধান দক্ষিণ এশিয়ায় বহু ধরনের প্রাচীন সঞ্চয়ন পদ্ধতি এখন পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় প্লাবন সমভূমি এবং ভারতের গঙ্গা প্লাবন সমভূমিতে দুর্যোগ সমন্বয়ন কৌশলসমূহের অধিকাংশই প্রতিরোধের পরিবর্তে সংশোধনমূলক। এই অঞ্চলে বন্যা ও ঘুর্ণিঝড় মোকাবেলা কৌশল অতি প্রাচীন কালের যার উদ্ভাবন হয়েছে মানুষের প্রকৃতির সাথে অতি নিবিড় সম্পর্কের ফলে। এখানকার মানুষ বন্যার সাথে বসবাস কৌশলে অভ্যস্ত। মধ্যযুগ থেকে ভারতে যে ৭৯টি নদী তীরবর্তী নগর গড়ে উঠে তার ৩০ শতাংশ গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এবং বন্যার সাথে বসবাস কৌশলে অভ্যস্ত।

বাংলাদেশের কৃষকরা বন্যা, খরা ও বিভিন্ন পরিবেশগত অবস্থার সাথে সমন্বয় রেখে কৃষিকাজ করে আসছে। এক্ষেত্রে তাদের প্রকৃতির সাথে প্রত্যক্ষণই মূলত কাজ করছে। তবে মাঝে মাঝে চরম দুর্যোগ মানুষের এই প্রকৃতির সাথে সমন্বয়কে বাধাগ্রস্ত করেছে। কারণ এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশকে রূপান্তর বা নিয়ন্ত্রণ করার যথাযথ প্রযুক্তির অভাব রয়েছে।

(খ) শিল্পোত্তর আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সমন্বয়ন (Post-industrial Adjustment Strategies with Modern Technology) :

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি দ্বারা প্রকৃতিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তি দ্বারা দুর্যোগ মোকাবেলা প্রধানত বৃহৎ আকারের কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে হয়ে থাকে যা অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে এই ধরনের সমন্বয়ন প্রক্রিয়া প্রধানত উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে দেখা যায় যারা আর্থিকভাবে উন্নত, বিজ্ঞানসম্মত বৃহৎ আকারের নির্মাণশৈলিতে পারদর্শী এবং যেখানে স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান। কারণ এই ধরনের সমন্বয় কৌশল বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

কাঠামোগত ব্যবস্থাসমূহ সাধারণত নিম্নরূপ হয়ে থাকে-

১. বিশেষ কৌশলে নির্মিত জলাধার- যা নদীর সর্বোচ্চ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে;
২. বিভিন্ন প্রকারের বাঁধ: নদী খাতে বন্যা প্রতিরোধের নিমিত্তে পানি প্রবাহকে আবদ্ধ রাখার জন্য বাঁধ দেওয়া হয়;
৩. নদী খাতের উন্নয়ন: যা নদী খাতের মধ্যদিয়ে পানি প্রবাহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে পানির সর্বোচ্চ স্তরকে হ্রাস করে;
৪. নদী শাসন : নদীর গতি পথকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নদীর উভয় তীর স্থায়ীকরণ;
৫. বন্যা উপপথ বা বন্যাপথ : যা বন্যা কবলিত বা বন্যা সম্ভাব্য মূল নদীর প্রবাহকে অন্য খাতে প্রবাহিত করে।

এছাড়াও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন খরা প্রতিরোধের জন্য খরা পীড়িত অঞ্চলে মেঘপবন (Cloud Seeding) দ্বারা বৃষ্টিপাত ঘটানো যায়। ঝড়ের শক্তি ও গতিপথ নিয়ন্ত্রণ, শিলাবৃষ্টি

দমন, কুয়াশা বিচ্ছুরণ, হিমানি সম্প্রপাত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করা। উন্নত দেশসমূহে উপকূলীয় বন্যা প্রতিরোধে সমুদ্র প্রাচীর এবং গ্রোয়েন নির্মাণ প্রযুক্তি প্রচলিত রয়েছে। জৈবিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সমস্ত প্রযুক্তি বিভিন্নভাবে মানুষের কল্যাণে অবদান রাখলেও বিভিন্ন প্রযুক্তির নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় তুলনামূলকভাবে ক্ষতি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদির ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশি, যেমন বাঁধ, প্রাকৃতিক বাঁধ বা ড্যাম ইত্যাদি প্রযুক্তির ব্যবহার। ফলে অর্থনেতিকভাবে দুর্বল অর্থনৈতিক অঞ্চলে উন্নত প্রযুক্তি ততটা পসার লাভ করেনি। কাজেই দুর্যোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহারের ব্যয় যদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদির ব্যয়ের তুলনায় কমিয়ে আনা যায় তবে দুর্যোগ প্রতিরোধে প্রযুক্তিগত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি জনপ্রিয়তা পাবে। তবে এক্ষেত্রে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রযুক্তির ব্যবহার প্রকৃতির ভারসাম্য যেন নষ্ট না করে। অস্বাভাবিক চরম দীর্ঘমেয়াদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনার তুলনায় পুন:পুন সংঘটনশীল দুর্যোগসমূহ কাঠমোগত প্রযুক্তি দ্বারা দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ আর্থিক দিক থেকে অধিকতর লাভজনক।

শিল্পোত্তর সমন্বয় কৌশল মূলত লোকজ এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত পদ্ধতিসমূহ একত্রিত করে একটি বৃহৎ পরিসরের সমন্বয়নে সৃষ্টি করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম এই সমন্বয় প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানব উন্নয়নের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। ফলে একটি সুষম বাস্তব্য অবস্থার সৃষ্টি করে।

দুর্যোগের মাত্রা তিনটি মৌলিক কৌশলের মাধ্যমে হ্রাস করা যেতে পারে-
ক. দুর্যোগজনিত ক্ষতিকে স্বীকার করে অথবা ক্ষতির অংশীদার হয়ে;
খ. চরম ঘটনাকে পরিমিত অথবা প্রভাবকে নমনীয় করে;
গ. সম্পদ ব্যবহারের অথবা অবস্থানের পরিবর্তন করে। এছাড়াও দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রস্তুতিকরণ দুর্যোগের মাত্রা হ্রাস করে।

(ক) ক্ষতি স্বীকার করে বা ক্ষতির অংশীদার হয়ে (To Admit the Loss or Being a Partner of the Loss) : গ্রামীণ কৃষি সমাজে প্রধানত দেখা যায় দুর্যোগ পরবর্তীকালে দুর্যোগ প্রতিরোধের সাড়া হিসেবে গ্রামবাসীরা ক্ষতি স্বীকার করে নেয় বা ক্ষতির অংশীদার হয় যা বাংলাদেশের মতো গ্রামীণ সমাজের একটি সাধারণ আচরণ। ছোট আকারের দুর্যোগের ক্ষতিকে স্বীকার করে নেওয়া অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লাভজনক। অস্বাভাবিক দুর্যোগে পরবর্তী সময়ে বন্যাপীড়িত নিচু অঞ্চলে অধিক উৎপাদনের জন্য অধিক হারে কৃষি উপকরণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার যে সমস্ত জমি দীর্ঘদিন ধরে বন্যা প্লাবিত থাকে, সেই সমস্ত জমিগুলো স্বল্পকালীন সময়ের জন্য পরিহার বা সীমিত মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার খরা তীব্র আকার ধারণ করলেও কৃষকরা শস্য উৎপাদন চালিয়ে যায়। ফলে শস্য উৎপাদন বিঘ্নিত হলেও সামগ্রিকভাবে শস্যহানি হয় না। যখন কোন সমাজে ক্ষতির মাত্রা অত্যন্ত বেশি হয়, তখন ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে বর্ধিত পরিবারসমূহ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। ক্ষতির মাত্রা অধিক হলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী পর্যন্ত সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। উন্নত দেশসমূহে অপ্রথাগত ব্যবস্থাপনা, যেমন বীমা প্রকল্প, দুর্যোগ ত্রাণ, সরকারী সাহায্য ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(খ) চরম ঘটনাকে পরিমিত অথবা প্রভাবকে নমনীয় করে (Moderating the Incident or Making the Impact Less) : ব্যক্তিগত উদ্যোগের পরিবর্তে সমবেতভাবে দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের মাধ্যমে চরম ঘটনা পরিমিত পর্যায়ে আনা সম্ভব। তবে এই ধরনের সমন্বয়নে পুঁজি ও সময়ের প্রয়োজন। গণচীনের কমিউন ব্যবস্থা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ সমবেতভাবে দুর্যোগ মোচনে অংশগ্রহণ করে। সমবেত প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জিত হওয়ায় জনসাধারণ দুর্যোগ মোচনে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।

দুর্যোগ কবলিত এলাকায় দুর্দশা লাঘব সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা, আশা-আকাংখা, দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায় - ফলে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে চাহিদা অনুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব। উন্নয়ন পরিকল্পনায় তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠকদের অংশগ্রহণ আবশ্যক। প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, পরিচালনা ও সংরক্ষণের কাজেও তাদের নিয়োজিত করতে হবে। এর ফলে দুর্যোগ মোচন পরিকল্পনা সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে।

বিভিন্ন প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কৌশল, যেমন ভূমি ব্যবহার আইন, অঞ্চলায়ন ধারা অধ্যাদেশ, অট্টালিকা নির্মাণ বিধি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। ভূমি ব্যবহার আইনের দ্বারা প্রায় সকল বন্যা পীড়িত অঞ্চলে ভূমির ব্যবহারকে প্রভাবান্বিত করা যায়। চরম বিপজ্জনক অঞ্চলে পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়নের প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক। এছাড়াও ভূমিস্বত্ত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন করে, ভূমি ভোগ দখল ব্যবস্থার সংস্কার করে দুর্যোগের প্রতিকূল প্রভাবের তীব্রতাকে হ্রাস করা সম্ভব। একইভাবে শহরে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন করে দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাবের তীব্রতা হ্রাস করা সম্ভব। দুর্যোগের পরবর্তীকালে উন্নত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, নির্মাণ বিধি, বসতি আইন প্রণয়ন করে পরবর্তী দুর্যোগের ঝুঁকি এবং ক্ষতি হ্রাস করা যায়।

অঞ্চলীকরণ অধ্যাদেশ দ্বারা দুর্যোগপীড়িত এলাকায় মুখ্য অবয়ব নির্মাণের জন্য নির্দেশাবলী প্রণয়ন করে ভূমি উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্যোগের প্রকোপ যেখানে বহুদূর বিস্তৃত সেখানে বিভিন্ন প্রকল্প কৌশলের মাধ্যমে, যেমন অট্টালিকা নির্মাণ বিধি (ভূমিকম্প প্রতিরোধ গঠন কাঠামো), কৃষি প্রণালী বিধি (খরা অথবা শিলাবৃষ্টির সাথে সমন্বয় করে কৃষি ব্যবস্থা) প্রবর্তন করা যেতে পারে।

এছাড়াও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে চরম দুর্যোগ ঘটনাকে পরিমিত পর্যায়ে রাখা সম্ভব। রাস্তার উন্নয়ন, পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা, আশ্রয়স্থল নির্মাণ অবকাঠামোগত উন্নতির অন্তর্ভুক্ত। রাস্তার উন্নয়ন দুর্যোগকালীন সময়ে দ্রুত স্থান ত্যাগে ভূমিকা রাখে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের উন্নতি অন্তর্ভুক্ত। আবাহাওয়া পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব। বন্যা নিয়ন্ত্রণ (Lood Proofing) প্রোগ্রামের অধীনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। এই সমস্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণে সরকারের সাথে সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতার প্রয়োজন।

গ. সম্পদ ব্যবহারের অথবা অবস্থানের পরিবর্তন করে (Changing the Use of Resources or Location) : এর মধ্যে পড়ে সম্পদ পুনর্বিন্যাস বা তার ব্যবহার পরিবর্তন এবং স্থায়ী বা অস্থায়ী অভিগমন। বিপদাপন্ন এলাকার ভূমি নিয়ন্ত্রণ করে ভূমি ব্যবহারের আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূমি পুনর্বিন্যাস করা যায়। দুর্যোগ এলাকায় মানুষের বসবাসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বনায়ন বা অন্য পরিবেশ অনুকূল ব্যবহারের প্রবর্তন করা যায়। বিপজ্জনক এলাকা থেকে লোকজন স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অপসারণ করে জীবনহানি রোধ করা সম্ভব। খরা অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে গণ অভিগমন একটি কার্যকরী সমন্বয়ন পদ্ধতি। দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিল, উত্তর আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে এই ধরনের গণ অভিগমন পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

দুর্যোগ পরবর্তীকালে জরুরী ব্যবস্থাসমূহ, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করলে জীবন হানির সম্ভাবনা হ্রাস পায়। জনসাধারণকে দুর্যোগ সম্বন্ধে সতর্ক রাখা দুর্যোগ মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রস্তুতিকরণ হচ্ছে পূর্ব পরিকল্পিত জরুরী সচেতনতামূলক ব্যবস্থা। এই কর্মসূচীতে দুর্যোগ পূর্ব পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত। গণশিক্ষা, সচেতনতা, প্রচারণা, বিপদ সংকেত ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও এলাকা উন্নয়নের পরিকল্পনা, স্থানত্যাগী জনগণের জরুরী খাদ্য সরবরাহ ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও দুর্যোগ এলাকা চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস দুর্যোগ প্রস্তুতির মধ্যে পড়ে। দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য নির্দেশাবলী প্রণয়ন, জরুরী কার্যক্রম, দুর্যোগ ত্রাণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি পুনর্গঠন পরিকল্পনা দুর্যোগ পরবর্তী পরিকল্পনা ও পুনর্বাসনের অন্তর্ভুক্ত।

দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনা এমন হবে যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একবার আঘাত হানলে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। দুর্যোগ হ্রাসকরণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় কর্মসূচীর উন্নয়ন আবশ্যক। দুর্যোগ পূর্ব পরিকল্পনায় জনগণের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমন্বয় কৌশলসমূহে সময় অনুসারে কয়ভাবে ভাগ করা যায় এবং কি কি ?
২. শিল্প পূর্ব যুগে মানুষের দুর্যোগ সমন্বয় কৌশল কেমন ছিল?
৩. শিল্প পূর্ব যুগে মানুষ কিভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতো?
৪. চীন বন্যা প্রতিরোধে কি করতো?
৫. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এবং ভারতের গঙ্গা প্লাবন সমভূমিতে দুর্যোগ সমন্বয় কৌশল কি ধরনের?

৬. বাংলাদেশের কৃষকরা খরা, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের কোন বিষয়টি মূলত কাজ করে?
৭. শিল্পোত্তর যুগে মানুষের দুর্যোগ সমন্বয় কৌশলে কিসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়?
৮. দুর্যোগ মোকাবেলায় বৃহৎ কাঠামো প্রধানত কোন দেশসমূহে দেখা যায়?
৯. কি ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কাঠামোগত প্রযুক্তি আর্থিকভাবে অধিক লাভজনক?
১০. কাঠামোগত ব্যবস্থাসমূহ কি কি প্রকারের হয়ে থাকে?
১১. দুর্যোগের মাত্রা হ্রাস করার কৌশলসমূহ কি কি?

নিচের সারাংশটি পড়ে পাঠটি সম্বন্ধে আপনার ধারণাটি আরও পরিষ্কার করুন।

পাঠসংক্ষেপ :

প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত চরম ঘটনাবলীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে তখনই দুর্যোগ বলে অভিহিত করা হয় যখন এই ঘটনায় জীবন ও সম্পদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। বিশ্বে প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত হলেও প্রকৃতি ও মানুষের মিথস্ক্রিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্য বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ফলে মানুষ অধিক মাত্রায় প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণে সচেষ্ট হয়েছে। সম্পদ আহরণ ও ভোগের জন্য মানুষ অধিক মাত্রায় শহর ও অন্যান্য সুবিধাজনক এলাকায় কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই সমস্ত এলাকা যত বেশি দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় অবস্থিত হচ্ছে ততই দুর্যোগের ঘটনা বাড়ছে। কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষকে ক্রমাগত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বসবাসে বাধ্য করছে।

শিল্পপূর্ব যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের সমন্বয় কৌশল গ্রহণে পরিবেশ প্রত্যক্ষণের বিশেষ ভূমিকা ছিল, যার জন্য সমন্বয় কৌশল ছিল অতি সাধারণ। শিল্পোত্তর যুগে লোকজ ও আধুনিক কাঠামোগত ও অন্যান্য প্রযুক্তির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। দুর্যোগের মাত্রা কয়েকটি কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে হ্রাস করা সম্ভব। এগুলো হলো দুর্যোগজনিত ক্ষতিকে স্বীকার অথবা ক্ষতির অংশীদার হয়ে, চরম ঘটনাকে পরিমিতকরণের মাধ্যমে, সম্পদ ব্যবহার অথবা অবস্থানের পরিবর্তন করে। এছাড়াও দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং দুর্যোগ প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের মাত্রা হ্রাস করা সম্ভব।

অনুশীলনী

পাঠটি কয়েকবার ভালভাবে পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।
১. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংজ্ঞা দিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখুন।
২. শিল্পপূর্ব দুর্যোগ সমন্বয় কৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখুন।
৩. শিল্পোত্তর দুর্যোগ সমন্বয় কৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৪. দুর্যোগের মাত্রা কি কি কৌশলের মাধ্যমে হ্রাস করা সম্ভব? কৌশলগুলো সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

১.১ প্রতিবছর কত লক্ষ লোক প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয় ?
ক. এক লক্ষের উপর খ. তিন লক্ষের উপর গ. আড়াই লক্ষের উপর

১.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী মোট ক্ষতির পরিমাণ কত?
ক. ৪০,০০০ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার
খ. ২০,০০০ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার
গ. ১০,০০০ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার

১.৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হয় কি দ্বারা?
ক. খরা খ. বন্যা গ. ঘূর্ণিঝড়
১.৪ বার্টন ও কেট্স প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন?
ক. চারটি খ. ছয়টি গ. দুটি
১.৫ কোন অঞ্চলের মানুষ বন্যার সাথে বসবাস কৌশলে অভ্যস্ত।
ক. আমেরিকার সমভূমি অঞ্চল
খ. মধ্যপ্রাচ্যের উপকূলীয় অঞ্চল
গ.বাংলাদেশের উপকূলীয় প্লাবণ সমভূমি ও ভারতের গঙ্গা প্লাবণ সমভূমি

২. শূন্যস্থান পূরণ করুন: (সময় ৫ মিনিট):

২.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত সর্বসাধারণ স্বীকৃত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যা .....ও .....প্রভূত ক্ষতি করে।
২.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত .....পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।
২.৩ শিল্পপূর্ব সমাজে দুর্যোগ সমন্বয় কৌশল ছিল ....।
২.৪ চীনে প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও পূর্ব থেকে বন্যা প্রতিরোধে জমিতে .....নির্মাণ প্রচলিত রয়েছে।
২.৫ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ....দ্বারা দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (সময় ১৬ মিনিট):

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় ?
২. দুর্যোগকে কখন দুর্যোগ বলা যাবে না ?
৩. মানুষ শহরসহ অন্যান্য সুবিধাজনক এলাকায় কেন কেন্দ্রীভূত হচেছ ?
৪. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় জলোচছ্বাসে কেন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে?
৫. কি কারণে মেঘপবন দ্বারা বৃষ্টি ঘটানো হয় ?
৬. কোন ধরনের দুর্যোগসমূহ কাঠামোগত প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ আর্থিক দিক থেকে অধিক লাভজনক?
৭. বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ দুর্যোগ পরবর্তী কালে সাধারণত কি করে?
৮. কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি পরিমিত পর্যায়ে আনা সম্ভব?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংজ্ঞা দিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃতি আলোচনা করুন।
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগের শ্রেণীবিভাগ করুন। প্রত্যেক শ্রেণির অধীনস্থ প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ উল্লেখ করুন।
৩. শিল্পপূর্ব এবং শিল্পোত্তর দুর্যোগ সমন্বয় কৌশল সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।
৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রাকে কি কি কৌশলে হ্রাস করা যেতে পারে? সংক্ষেপে কৌশলসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ইউনিট ৬

পাঠ-৬.১

১.
১.১. ক. (প্রকৃতি)
১.২. গ. (মানুষ)
১.৩. ক. (চাহিদা বেড়েছে)
১.৪. খ. (প্রযুক্তিগত উন্নতি)
২.
২.১. সবুজ বিপ্লব
২.২. কৃষি জমির
২.৩. বনভূমি

পাঠ-৬.২

১.১. স, ১.২. মি, ১.৩. মি, ১.৪. স।
২.১. অধঃপাতের, ২.২. ১১.৩, ২.৩. বৃদ্ধি, ২.৪. ৫৯, ২.৫. পশুচারণ, ২.৬. ক্রান্তীয় ।

পাঠ-৬.৩

১.১. স, ১.২. মি, ১.৩. মি, ১.৪. স।
২.১. পানি, ২.২. ক্লোরিন, ২.৩. , ২.৪. আর্সেনিক, ২.৫. পরিচর্যা, ২.৬. ক্ষয়, অপসারণ।

পাঠ-৬.৪

১.১. উন্মুক্ত, ১.২. শব্দ ১.৩. নার্ভের ১.৪. পুষ্টি।

পাঠ-৬.৫

১.১, গ. (আড়াই লক্ষের উপর) ১.২. ক. (৪০,০০০ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার) ১.৩. খ. (বন্যা) ১.৪. গ. (দু'টি) ১.৫. গ. বাংলাদেশের উপকূলীয় সমভূমি ও ভারতের গঙ্গা প্লাবণ সমভূমি।
২.১. জীবন, সম্পদের ২.২. ক্ষয়ক্ষতির, ২.৩. অতি সাধারণ, ২.৪. আইল, ২.৫. আধুনিক প্রযুক্তির।

এই ৩১৫ নং পৃষ্ঠাটি ডিটিপিতে আছে।

ইউনিট-৪, ৫ ও ৬

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Daniel, P. and Hopkinson, M. 1992. the Geography of Settlement. London: Oliver and Boyd.
Doxiadis, C.A. 1968. Ekistics: the Science of Human Settlements. London: Hutchinson.
Mandal, R.B. 1979. Introduction to Rural Settlements. New Delhi: Concept.
Singh, R. L., Singh, K. N. and Singh, R.P.B. (eds), 1975. Readings in Rural Settlement Geography. Varanasi: NGSI.
Singh, R. L., Singh K.N and Singh R.P.B (eds), 1976. Geogrpahic Dimensions of Rural Settlemen:s. Varanasi: NGSI.
Sultana, S. 1993. Rural Settlement in Bangladesh: Spatial Pattern and Development. Dhaka: Graphosman.
Doxiadis, C.A. 1968. Ekisticst: the Science of Human Settlements. London: Hutchinson.
Mandal, R.B. 1979. In:roduction to Rural Settlements. New Delhi: Concept.
Singh, R. L., Singh, K. N. and Singh, R.P.B. (eds), 1975. Readings in Rural Settlement Geography. Varanasi: NGSI.
Singh R. L., Singh K.N and Singh R.P.B (eds), 1976. Geogrpahic Dimensions of Rural Settlements. Varanasi: NGSI.
Sul:ana, S. 1993. Rural Settlement in Bangladesh: Spa:ial Pattern and Development. Dhaka: Graphosman.
Robert, B. K. 1996. Landscapes of Settlements. London: Routledge.
ইলাহী, কে. ম. ২০০৩। পরিসংখ্যান ভূগোল। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
Christaller, W. 1933. Central Places in Southern Germany (tr. by Baskin, C. W. 1966) Englewood : Prentice-Hall.
Hudson, J. C. 1969. A Location theory of Rural Settlements; in : Singh, R.L., Singh, K. N. and Singh, R. P.B (eds). 1975.
Roberts, Brian K. 1996. Landscapes of Settlements. London & NewYork : Routledge.
Bylund, E. 1975. Theoretical Consideration Regarding the Distribution of Settlement in Inner North Sweden; in : Singh, K. N. and Singh, R. P. B. (eds). 1975.
Singh, R.L., Singh, K. N. and Singh, R. P. B. (eds). Readings in Rural Settlement Geography. Varanasi : NGSI.
Sultana, S. 1993. Rural Settlements in Bangladesh: Spatial Pattern and Development. Dhaka: Graphosman.
Tidswell. W. V. & Barker. S. M. 1971. Quantitative Methods: An Approacth to Socio-economic Geography. London: Univ. tutotial Press L:d.
Carter, H. 1975. the Study of Urban Geography. London: Edward Arnold Ltd.
Doxiadis, C. A. 1968. Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlements. London: Hutchinson.
Goodall, B. 1987. the Penguin Dictionary of Human Geogrphy. England: Penguin Books Ltd.
Jonston R. J. and Others (eds), 1990. Dictionary of Human Geography. Oxfords: Basil Blackwell Ltd.
Bradford, M. G. and Kent, W. A. 1994. Human Geogrpahyt theories and their Application. Oxford: Oxford University Press.
Haggett. P. 1969. Locational Analysis in Human Geogrpahy. London: Edward Arnold Ltd.
Johnston, R. J. and others (ed), 1990. the Dictionary of Human geography. Oxford: Basil Blackwell L:d.
Goodall, B. 1987. the Penguim Dictionary of Human Geogrpahy. England: Penguin Book L:d.
(UNESCO, 1999). Population Education in Asia and the Pacifict News Letter and Forum. Population Education Programme, UNESCO, Principal Regional Office for Asia and :he Pacific.
Bourne, L.S.(ed), 1971. In:ernal Structure of the City: Readings on Space and Environment. London: Oxford University Press.
Glaer, N. 1970. Cities in tronble. Chicage: Quadrangle Books.
Ehrlich, P. R. and Ehrlich. A. H. 1970. Population, Resource, Environment: Issues in Human Ecology. San Fransisco: W. H. Freeman and company.
রশীদ, সা. ১৯৯৩। শহরে মোটরযানজনিত বায়ু দূষণ: একটি প্রাথমিক সমীক্ষা। ভূগোল পত্রিকা, ১২।

Bardo, J. W. & Hartman, J. J. 1982. Urban Sociology: A Systematic In:roduction. USA: F.E. Peacock Publishers Inc.

Johnston, R. J. and others (ed), 1999. the Dictionary of Human Geography. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Goodall, B. 1987. the Penguin Dictionary of Human Geography. England: Penguin Book Ltd.

Berry, B. J. L. 1967. Geography of Market Centres and Retail Distribution: New Zealand: Prentice Hall Inc.

Johnston, R. J. and others (ed), 1990. the Dictionary of Human geography. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Goodall, B. 1987. the Penguin Dictionary of Human Geogrpahy. England: Penguin Book L:d.

Glasson, J. 1980. In:roduciton to Regional Planning: Concepts, theory and Practice. London: Hutchinson.

Johnston, R. J. and others (ed), 1990. the Dictionary of Human Geography. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Goodall, B. 1987. the Penguim Dictionary of Human Geogrpahy. England: Penguin Book Ltd.

Ahmed, M.F. (ed), 2000. Bangladesh Environment 2000. Dhaka: BAPA (Bangladesh Poriesh Andolon)

Gupta. A. 1988. Ecology and Development in the third World. London: Routledge.

Sadik. N. 1990. the State of World Population. UNO Publication.

Ehrlich, P. R. and Ehrlich, A. H. 1970. Population, Resources and Environment: Issues in Human ecology. San Frascisco: W.H. Freeman and Company.

ইসলাম, এম. আমিনুল। ১৯৮৮। সম্পদ ব্যবস্থাপনা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Goodall, B. 1987. the Penguin Dictionary of Human Geography. England: Penguin Books Ltd.

ইসলাম, এম. আ.। ১৯৮৮। সম্পদ ব্যবস্থাপনা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Goodall, B. 1987. the Penguin Dictionary of Human Geography. England: Penguin Books Ltd.